সত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধী

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, [illegible] রো, কলিকাতা — ৭

প্রকাশক :
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫/১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : কার্ত্তিক, ১৩৬৫

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রাকর
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিংটিং ওয়ার্কস্
২৫/১/এ কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯



"আমি সাধু নই, রাজনীতিকও নই। সত্য যে অখিল
জ্ঞানের উৎস ইহাই আমি মাঝে মাঝে
অনুভব করি মাত্র।"

সত্যাগ্রহী

মহাত্মা গান্ধী

॥ গান্ধীজীর বাণী ॥

"আমি দেশের সেবক"

আমি মহাত্মা নই, আমি দীনাতিদীন, কেবল "মহাত্মা" নামের দুঃখ ভোগের বোঝা মাথায় লইয়া বেড়াইতেছি। আমি ঋষি নই, মুনি নই, অবতার নই, নই সন্ন্যাসী। আমি গৃহী, আমি দেশের সেবক, আমি শুধু সত্য-সন্ধানী। আমি সাধু নই, রাজনীতিকও নই। সত্য যে অখিল জ্ঞানের উৎস, ইহাই আমি মাঝে মাঝে গভীরভাবে উপলব্ধি করি মাত্র।''

॥ হিন্দুধর্ম ও অস্পৃশ্যতা ॥

''অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে, অধিকন্তু উহা হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট একটা পচনশীল পদার্থ, একটা ভ্রান্তি ও একটা পাপ। সুতরাং উহার মূলোৎপাটন করা প্রত্যেক হিন্দুরই ধর্ম ও পরম কর্তব্য। প্রত্যেক হিন্দুরই উহাকে পাপ মনে করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।"

॥ আমার ধ্যানের ভারত ॥

"আমি সেই ভারতই গড়িতে চাই, যে ভারতে দরিদ্রতম ব্যক্তিও মনে করিবে—এই তাহার দেশ, এই দেশে তাহার একটা সক্রিয় সত্ত্বা আছে।

সেই ভারতে থাকিবে না উচ্চ-নীচ ভেদ, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে থাকিবে অকুণ্ঠ প্রীতি।

সেই ভারতে থাকিবে না অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, থাকিবে না মাদকতার বিষ।

নারী সেই ভারতে ভোগ করিবে পুরুষের সমান অধিকার।

সেই ভারত করিবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জাতীর সঙ্গে সহযোগিতা।

আমরা অপরের শত্রু হইব না, অপরকে শোষণ করিব না, অপরকে আমাদের উপর শোষণ চালাইতে দিব না। এই আমার ধ্যানের ভারত।"

॥ গান্ধী ॥

কোটি-কোটি কণ্ঠেতে তোলো কল-নান্দী—
গান্ধীজী—গান্ধীজী—গান্ধীজী—গান্ধী।
পরিধানে কটিবাস,
কুটিরের কোণে-বাস,
ভালে ভায় ভানু-ভাস,
ভারতের গান্ধী
ভারতের গান্ধী সে মরতের গান্ধী।

হিংসার হুংকারে থরথর পৃথ্বী ;
মানবের দুর্মদ দানবের বৃত্তি।
সেই ক্ষণে সিংহ-স্বনে,
কে সে ভীম বিক্রমে
দেখায় রে জগজ্জনে
অহিংস পন্থা ?
গান্ধীজী—গান্ধী সে—হিংসার হন্তা।

বন্দুক, তরবার—সেকেলে সে অস্ত্র—
ধরেনি কো স্বাধীনতা-রণে কার হস্ত ?
চরকাই আধুনিক
অস্ত্র সে নির্ভীক
ধরে কোন্ সৈনিক
চমকায়ে বিশ্ব ?
গান্ধীজী—গান্ধী সে—সে কি নব ভীষ্ম ?

শীতাতপ তার কাছে পায় সদা লজ্জা ;
সত্যই সদা তার হয় সাজসজ্জা ;
তার করে যে লেখনী,
সেই খাঁটি মণি-খনি !
ধী-ধনে সে সদা ধনী—

ভারতের গান্ধী সে মরতের গান্ধী

বন্দে মাতরম্ !
বন্দে মাতরম্ !
বন্দে মাতরম্ !
ভারতমাতাকী জয় !
গান্ধীজীকী জয় !
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীজীকী জয় !
মহাত্মা গান্ধীকী জয় !

॥ গান্ধী গুণধি ॥

ভারতে ইংরেজ-শাসন কালে পরাধীন ভারতের ঐ বাণী ; বর্তমান কালের স্বাধীন ভারতের ঐ হচ্ছে ভারতের বাণী। ঐ বাণী চিরন্তনী বা চিরন্তন-ই।

পরাধীন ভারতে ঐ বাণী যেন হয়েছিল বাণ-ই, বিদ্ধ ও বিদীর্ণ করেছিল ভারতের বক্ষের উপরের পরাধীনতার প্রস্তরখানি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিরচিত "বন্দে মাতরম্" সংগীত দিয়ে পরাধীন ভারতের স্বাধীনতার সূচনা করলেন।

আরম্ভ হয়ে গেল ভারতের স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের এক অস্ত্র অগ্নিবাণী ; আর এক অস্ত্র অগ্নিবাণ।

সেই সংগ্রাম অগ্নিবাণী দিয়ে চালানো হয়েছে, এবং অগ্নিবাণ দিয়েও চালানো হয়েছে,—অগ্নিসম তেজোদ্দীপ্ত ভাবনা ও রচনা দিয়ে চালানো হয়েছে সংগঠন মূলক কার্য। এবং ইংরেজ-শাসনের সঙ্গে অসহযোগ করেও চালানো হয়েছে।

সেই সংগ্রাম অগ্নিবাণ দিয়েও চালানো হয়েছে—বিপ্লবীদের হস্ত-ধৃত আগ্নেয় অস্ত্র দিয়েও চালানো হয়েছে।

গান্ধী হচ্ছেন সংগঠন কার্য, অসহযোগ, ভাষণও রচনা ইত্যাদির সমবায়ে সংগঠিত সংগ্রামের প্রধান সৈনিক—নায়ক।—অগ্নিবাণী সংগ্রাম পরিচালনার নেতা।

গান্ধী গুণগন্ধী—গান্ধী গুণধী—গান্ধী বহু গুণযুক্ত মানব।

ফুল সুগন্ধযুক্ত। গান্ধী গুণগন্ধযুক্ত।

গান্ধীর গুণ মানুষের মনে তাঁর প্রতি প্রশংসার গুনগুন ধ্বনি তোলে।

গান্ধীর গুণ মানুষকে যেন গুণকরে—জাদুমন্ত্রের মতো মুগ্ধ করে।

এই জগৎ যাদুঘরে গান্ধীর বিচিত্র চরিত্রচিত্র মানুষের অতিশয় চিত্তাকর্ষক বটে।

॥ বংশ পরিচয় ॥

গান্ধীর সম্পূর্ণ নাম—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

গান্ধীর জনকের নাম—কাবা গান্ধী। জননীর নাম—পুতুলীবাঈ।

গান্ধী-গোষ্ঠী গুর্জরের অধিবাসী। গুজরী বা গুজরাট ভারতের পশ্চিম অংশে অবস্থিত।

ভারতের মোহন-মিহির ভারতের ঐ পশ্চিমেই উদিত হন, আবির্ভূত হন।

মোহন শব্দের অর্থ—সুন্দর। করমচাঁদ—কর্মচন্দ্র।

'গান্ধী' শব্দটির অর্থ—মুদি।

গান্ধী গোষ্ঠী বা গান্ধীপরিবার সুগৌরবী—সুগৌরবের অধিকারী।

কেন তাঁরা গৌরবের অধীকারী ?

গান্ধীগোষ্ঠী ভগবানে ভক্তিপরায়ণ; মানুষ ও অন্যান্য জীবের প্রতি পরম প্রীতিপরায়ণ। তাঁরা পরম বৈষ্ণব।

মোহনদাস করমচাঁদের পিতা কাবা গান্ধী গুর্জরের অন্তর্গত পোর-বন্দরে রাজকোট ক্ষেত্রে মন্ত্রীপদে আসীন ছিলেন। তারপরে তিনি আগমন করেন রাজকোটে। তিনি হন রাজকোটের রাজার দেওয়ান বা মন্ত্রী। কাবা গান্ধী ছিলেন এক কীর্তিমান মানুষ।

কাবা গান্ধী তিনবার বিবাহ করেছিলেন। তাঁর তৃতীয়া পত্নীর নাম পুতুলী বাঈ। পুতুলী বাঈ তিনটি পুত্র ও একটি কন্যার মাতা। মাতা পুতুলীর পুত্র মোহন দাস তাঁর সবচেয়ে কনিষ্ঠ সন্তান।

॥ পুণ্যপরায়ণা পুতুলী ॥

গান্ধীজীর জননী পুতুলী বাঈ ছিলেন অতিশয় পুণ্যবতী। সৎকার্যে সর্বদাই ছিল তাঁর মতি। পূজা-পার্বন অনুষ্ঠান ইত্যাদি ছিল তাঁর অতিশয় প্রিয়।

সূর্যদর্শন না হলে, পুতুলী বাঈ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করবেন না, এরূপ কঠোর ব্রতও তিনি পালন করেছিলেন। তাই বর্ষাকালে, এমন কি, পর পর তিন-চারি দিবসও তিনি খাদ্যদ্রব্য মুখে দেন নি, এরূপ অবস্থাও তাঁর হয়েছে।

একটি দিবসের একটি কাহিনী।

বর্ষাকালে একদিন আকাশে মেঘ রাশি-রাশি, আর বিদ্যুতের দীপ্ত হাসি। রবি-ছবি আর দেখা যাচ্ছে না। পুতুলী বাঈ মাঝে মাঝে গগন-পানে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন। কিন্তু মেঘের আবরণ ভেদ করে সূর্য তাঁকে দেখা দিতে পারলেন না। মোহনদাস তখন বালক। তিনি পুলক ভরে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন—সূর্যকে দেখা মাত্রই মাকে ডাকবেন।

মোহনদাসের মিষ্টি দৃষ্টি আকাশের প্রতি নিবদ্ধ। হঠাৎ, সূর্য মেঘের ফাঁক দিয়ে মুখ বার করে মোহন দাসের মুখের দিকে চাইলেন।

মোহন তৎক্ষণাৎ তাঁর মাকে ডাকলেন, "মা, মা? শীগ্‌গির এস না! সূর্য উঠেছে—সূর্য উঠেছে!"

মাতা পুতুলী পুত্রের ডাক শুনে সত্বর এলেন তাঁর কাছে। কিন্তু সূর্য তখন কোথায়! সূর্য ইতিমধ্যে আবার মেঘের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে।

পুতুলী বাঈ সূর্য দর্শন করতে পারলেন না। তাই অন্নও গ্রহণ করতে পারলেন না। পুণ্যব্রত অনুষ্ঠানে যে আনন্দ, সেই আনন্দই হল সে দিন তাঁর অন্ন।—উপবাস থেকেও তিনি আনন্দহীন হলেন না।

॥ কাবা-পুতুলীর পুত্র মহান মোহনের আবির্ভাব ॥

কাবা-পুতুলীর পুত্র গুণনিধি গান্ধী।

আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বের একটি দিন। অনন্ত কালের কোটি কোটি দিনের মধ্যে সেই দিন আনন্দে নৃত্য করে ধিন্‌ধিন্! সেই দিন মানুষের মনে বাজায় আনন্দের বীণ।

কেন নৃত্য করে? কেন বীণ বাজায়? যেহেতু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই দিন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর। ভারত তখন পরাধীনতার অক্টোপাস-বন্ধনে আবদ্ধ। বিদেশী ইংরেজের শাসনের অধীন।

গুজরাটের কাথিয়াওয়াড় অঞ্চলে পোরবন্দর নামক স্থানে কাবা-পুতুলীর পুত্র মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন।

সেই শিশু পরবর্তী কালে বড় হয়ে যীশুর সঙ্গেও তুলনা প্রাপ্ত হয়েছেন।

গান্ধীজীকে বলা হয় "বাপুজী"। ভারতীয় 'জাতির জনক', বলা হয় 'মহাত্মা'।

॥ বাল্যে বিদ্যা-ধন আহরণ ॥

বালক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বিদ্যাশিক্ষা তাঁদের বাড়ীতেই আরম্ভ হয়। সেই বালক তাঁর সেই বয়সে বুদ্ধির তেমন কিছু পরিচয় প্রদান করতে পারেন নি।

তাঁর নামতা শিক্ষা হত যেন আমতা-আমতা করে। যোগ যেন হত দুর্ভোগ; বিয়োগ যেন দুঃখদায়ক হত আপন জনের বিয়োগের মতো।

মোহনদাসের বয়স বছর সাতেক হ'ল। তাঁর পিতার সঙ্গে তিনি চলে গেলেন রাজকোটে। সেখানে তিনি ছাত্র হলেন একটি প্রাথমিক পাঠশালার।

তার পরে মধ্যইংরেজী বিদ্যালয়ে; তার পরে, উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে গান্ধী বিদ্যাধন আহরণ করতে লাগলেন।

পরবর্তীকালে যে মোহনের মুখ বহু বহু কর্মক্ষেত্রে ভারতের মুখ রক্ষা করেছে, সেই মোহন বাল্যকালে ছিলেন মুখচোরা। সতীর্থ বা সহপাঠীদের সঙ্গেও তিনি কথা প্রায় বলতেনই না। বিদ্যালয়ের প্রথম ঘণ্টা বাজলে, মোহনদাস বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেন; বিদ্যালয়ের শেষ ঘণ্টা বাজল, মোহন গৃহে চলে গেলেন;—এই ছিল সেই ছেলের অবস্থা।

॥ সত্যই পরম পথ্য ॥

সত্য মানুষের পথ্য—হিতকর। মিথ্যা কুপথ্য অহিতকর।

গান্ধী যখন হয়েছিলেন ভারতের নেতা, তখন তিনি হয়েছিলেন সত্যাগ্রহী। তাঁর কৈশোর কালেও তিনি ছিলেন সত্যাগ্রহী বা সত্যানুরাগী।

কিশোর গান্ধী তখন রাজকোট বিদ্যালয়ের ছাত্র। এক দিন বিদ্যালয়ের পরিদর্শক জাইল্‌স্‌ নামক এক ইংরেজ এলেন সেই বিদ্যালয়ে।

তিনি গান্ধীদের শ্রেণীতে প্রবেশ করলেন। কতিপয় শব্দ ছাত্রদের লিখতে দিলেন। সেই কতিপয়ের মধ্যে "Kettle" শব্দটিও ছিল।

মোহনদাস ঐ শব্দটি নির্ভুলভাবে লিখতে পারলেন না। তাঁর পার্শ্বে দণ্ডায়মান শিক্ষক তাঁকে-ইশারায় বলে দিলেন, 'তোমার কাছের ছাত্রের লেখা দেখ। তাই দেখে, শুদ্ধ ক'রে লেখ।'

কিন্তু পরবর্তীকালের সত্যাগ্রহী গান্ধী তাঁর সেই বয়সেও সম্পূর্ণ সত্যাগ্রহী। তাই তাঁর শুদ্ধ চিত্ত ঐ শব্দের বানান শুদ্ধ করে লিখবার জন্য ঐ অশুদ্ধ পথ অবলম্বন করতে উৎসাহী হল না।

উপনিষদের উপাদেয় উক্তি :

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।

—*সত্যই জয়লাভ করে। মিথ্যা জয়লাভ করে না।*

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং,

ধর্মান্ন প্রমদিতব্যং,

কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্।

—সত্য হতে ভ্রষ্ট হবে না, ধর্ম হতে ভ্রষ্ট হবে না, শুভ কর্ম হতে বিরত হবে না।

বিদ্যালয়ের ছাত্র গান্ধী লেখাপড়ায় খুব যে ভালো ছিলেন, তা নয় ; ছিলেন মাঝামাঝি ধরনের। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বিদ্যালয়ের ছুটি হওয়ার পরে, বাড়ী যাওয়ার পথে তিনি কখনও বিলম্ব করতেন-না। তিনি বাড়ী গিয়ে, তাঁর পিতার সেবা করতেন।

পিতা সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত বাণী এইরূপ :

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ

পিতাহি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে

প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

—পিতাই স্বর্গ, পিতাই ধর্ম, পিতাই পরম তপস্যা। পিতা প্রীতি প্রাপ্ত হলে, সমুদয় দেবতা প্রীত হন।

'শ্রবণের পিতৃভক্তি' নামে চমৎকার একখানি পুস্তক গান্ধীজী পাঠ করেছিলেন। সেই অধ্যয়নের ফলে, পিতার সেবা করার জন্য তাঁর হৃদয়ে প্রবল ইচ্ছার সঞ্চার হয়। পিতার সেবার সময় করে

নেওয়ার জন্ত তিনি অন্য কোন কোন কাজ সম্পাদনে বিরত থাকতেন।

॥ জরিমানা ॥

আম উপাদেয় এবং পুষ্টিকর। ব্যায়ামও মানুষের পক্ষে সেইরূপ হিতকর। যে মানুষ রোজ ব্যায়ামরূপ আম আস্বাদন করে, ব্যাধি তার কাছ থেকে থাকে অনেক দূরে পড়ে।

কিন্তু কিশোর গান্ধী পিতৃসেবা সাধনে সময় ব্যয় করতেন। তাই ব্যায়াম করার সময় করে নিতে পারেন নি। তার ফলে, তাঁর শরীর বরাবরই থেকে গেছে দুর্বল।

গান্ধীর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দোয়াবজী এডুলজী গিমি। বিদ্যালয়ের খেলাধূলায় রোজই সব ছাত্রকে যোগদান করতে হবে,—একবার সেই গিমি মহাশয় এই নিয়ম প্রবর্তন করলেন।

গান্ধী তখন শিক্ষকের আদেশ অমান্য করতে পারেন না। তাই তিনি, প্রতিদিন যা হোক ক'রে তাঁর পিতার পরিচর্যা সমাধা ক'রে বিদ্যালয়ে এসে ব্যায়ামও করতে লাগলেন।

একদিন বিদ্যালয়ের ছুটি ছিল। আকাশের সূর্যও সেদিন যেন ছুটি নিয়েছিল—আকাশে খুব মেঘ থাকায়, গান্ধী সূর্য দর্শন করতে পারলেন না। তাই ব্যায়ামে যোগদান করার নির্দিষ্ট সময়ও স্থির করতে পারলেন না। তাই অস্থির চিত্তে তিনি ব্যায়ামস্থানে উপনীত হলেন। কিন্তু ছাত্রদের ব্যায়ামচর্চা তখন সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। ছাত্ররা বাড়ী ফিরে যাচ্ছে।

পরবর্তী দিবসে, প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধী বললেন, তিনি তাঁর বাবার সেবা করছিলেন। সূর্য তখন মেঘের আড়ালে ছিল ব'লে, তিনি সময়ও স্থির করতে পারেন নি। তাই ব্যায়ামে যোগদান করতে পারেন নি।

কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষী সেই শিক্ষক তাঁর ছাত্রের ঐরূপ পিতৃভক্তি তেমন বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি গান্ধীর জরিমানা করলেন আট পয়সা।

পরে শিক্ষকমহাশয় অবগত হলেন, গান্ধী অসত্য কথা বলেন নি। তখন কিশোর গান্ধীর সত্যবাদিতায় তিনি একটু বিস্মিত হলেন। স্মিতমুখে গান্ধীর জরিমানাও মাফ করলেন।

গুণবান গান্ধীর সত্যবাদিতা-গুণের আর একটি দৃষ্টান্ত তাঁর সেই বাল্যকালেও দেখা গেল।

মোহনদাস গান্ধীর জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের একজন বন্ধু ছিল। সে ছিল অসৎ, অসাধু। গান্ধী তাঁর ভ্রাতার সেই বন্ধুর সঙ্গে মিশতেন।

একদিন সেই অসৎ যুবকটি গান্ধীকে বলল, "এস, আমরা মাংস খাই।"

গান্ধী বললেন, "আমরা তো সবাই বৈষ্ণব।—মৎস্য-মাংস তো আমরা কখনও আহার করি না।"

সেই অসাধু যুবক তখন মাংস আহারের উপকারিতার অনেক কথা গান্ধীকে বলল।

গান্ধী মাংস-আস্বাদন করতে সম্মত হলেন। মাংস সংগ্রহ করা হল। নদীর কূলে একটা নির্জন জায়গায় সেই যুবক মাংস রান্না করল। তার পর আহার শুরু হল। কিন্তু গান্ধীর মুখে মাংস ভালো লাগল কি? লাগল না। তিনি খেতে পারলেন না।

তার পরে যথা সময়ে, রাত্রে তাঁর ঘুম এল। তখন এক স্বপ্ন তিনি দেখলেন। -গান্ধী স্বপ্নে দেখলেন, সেই পরলোকগত পাঁঠা বেঁচে উঠেছে। পাঁঠা তাঁর পেটের মধ্য নড়াচড়া করছে, হা হুতাস করছে; পেট পরিত্যাগ করে, পৃথিবীর মাটিতে পদার্পন করতে চাইছে।

গান্ধীর নিদ্রাভঙ্গ হল। তারপরে, বার বার তিনি নিদ্রিত হতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘুম তাঁর এল না; ঘুম তাঁর পেল না। অথচ অস্বস্তিও গেল না।

দিনের দ্বিপ্রহরে মাংস আহার আরও কিছু দিন ধরে চলল। কিন্তু তার ফলে, রাত্রে তাঁর তেমন ক্ষুধা পেত না; খেতে ইচ্ছা হত না।

গান্ধীর জননী পুতুলীবাঈ গান্ধীর সেই আহারের অরুচির কারণ জানতে চাইতেন।

গান্ধী তখন যা বলতেন, তা সত্য নয়। কিন্তু মাতার নিকট মিথ্যা কথা বলে গান্ধী বড়ই দুঃখ বোধ করতেন।

মিথ্যারূপ ময়লা আবর্জনা অবলম্বন করে অবস্থান করা গান্ধীর পক্ষে বড়ই কষ্টদায়ক হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত, মাংস আহারের ইচ্ছা তাঁর মন থেকে ভাগল; সত্য বিজয়ী রূপেই তাঁর মনে জাগল।

মাংসের প্রতি মমতা তিনি ত্যাগ করলেন।

॥ ধূমপানের ধুমধাম ॥

সৎ ছেলে গান্ধী একটি অসৎ ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন। তার ফলে তিনি ধরলেন একটা নেশা—বিড়ি খাওয়া, ধূমপান করা।

ধোঁয়া না খেয়ে, মোয়া খাওয়া উচিত। ধূমপান করতে করতে, মানুষকে মনের ভাবও ধূমের মতো বা ধোঁয়ার মতো হয়ে যায়—অসার হয়ে যায়—এইকথা গান্ধী তখন বুঝতেন না।

গান্ধীর খুল্লতাত মহাশয় বিড়ি খেতেন। তিনি বিড়ির অদগ্ধ যে অংশটা ফেলে দিতেন, গান্ধী সেটা সংগ্রহ করতেন; তার পর

তাঁর সেই বদ্ সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হতেন ; তখন চলত ধূমপানের ধূমধাম।

তার পরে বিড়ি ক্রয় করার পয়সা সংগ্রহ করার জন্য গান্ধী তাঁদের বাড়ির ভৃত্যদের জামার জেব থেকে গোপনে পয়সা সংগ্রহ করতে লাগলেন।—বিড়ির জন্য আরম্ভ হল চুরি।—কিন্তু চুরি আর কত দিন চলে!

সেই পাপ গুণবান গান্ধীর মনে সৃষ্টি করল অনুতাপ। গান্ধীর সেই সঙ্গী এবং গান্ধী স্থির করলেন, তাঁরা ধুতুরার বীজ ভক্ষণ করে আত্মহত্যা করবেন।—ঐরূপে তাঁদের চিত্ত করতে চাইল তাঁদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

ধুতুরার বীজ যোগার করে, দুই জনে দিবসের অবসানে, সন্ধ্যার সমাগমে, প্রবেশ করলেন কেদারজী দেবতার মন্দিরে।

কিন্তু ধুতুরাবীজ-বিষ মুখে দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়ে কেঁপে উঠল আঁত। আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছাটা হয়ে গেল মাত।

তাঁরা চঞ্চল মন নিয়ে মন্দিরে থেকে বেরিয়ে এলেন। একটু পরে প্রবেশ করলেন রামজীমন্দিরে। গান্ধী তাঁর সঙ্গীকে বললেন, আয় আমরা প্রার্থনায় মন দি রে!—প্রার্থনা করে, দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

তাঁরা করলেন তাই।

সেই দিনকার সেই ধাক্কা খাওয়ার মতো ব্যাপারটার ফলে, গান্ধীজীর ধূমপানের ইচ্ছা চিরদিনের মতো উধাও হয়ে গেল।

॥ মোহন হয়ে উঠলেন মোহন ॥

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আরও একবার চুরির পথে চলেছিলেন।

মোহন গান্ধী একজনের নিকট থেকে কয়েকটি টাকা কর্জ করেছিলেন। শোধ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবু শোধ দিতে পারেননি। সেই ঋণ পরিশোধ করবার জন্য একদিন গান্ধীর মন হয়ে পড়ল দীন—চুরি করবার দুর্বল মনোভাব এল তাঁর মধ্যে। গান্ধী তাঁর ভ্রাতার হাতের তাবিজের কিঞ্চিৎ স্বর্ণ চুরি করলেন। সেই স্বর্ণ বিক্রয় করলেন, ঋণ পরিশোধ করলেন। কিন্তু চুরি করে ঋণ পরিশোধ তাঁকে যেন দিতে লাগল প্রতিশোধ—খুব দুঃখ হল ; খুব অনুতাপ হল।

মোহন গান্ধী তাঁর পিতার নিকট একখানি পত্র লিখলেন। সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে কাবা গান্ধী অবগত হলেন, তাঁর সুসূনু বা সুপুত্র কয়েকটা কুকর্ম করেছে, তার জন্য পিতার চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

তারপরে মোহন গান্ধী লক্ষ্য করলেন, তাঁর বাবা কাবা অশ্রুপাত করছেন। – সেই অশ্রু দুঃখের অশ্রু ; সেই অশ্রু আনন্দের অশ্রু !—কাবাগান্ধী বুঝতে পারলেন, তাঁর মোহন হয়ে উঠেছে মোহন ! – তাঁর মোহনের চিত্তবিত্ত কত মোহন—কত সুন্দর !—কত নির্মল !

সেই কাল থেকে মোহনের মন থেকে পাপ পরোলোকে প্রস্থান করল—দূর হয়ে গেল চিরকালের তরে।

মোহন ধীরে ধীরে মহাত্মা হয়ে উঠছেন।—মোহন মহাত্মা গান্ধী হয়ে উঠছেন।

॥ মর্মক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র ॥

এই সময়ে দেখা যাচ্ছে, গান্ধীজীর মর্মক্ষেত্র—মন—ধর্মকে ধারণ করতে চাইছে—ধরতে চাইছে।

গান্ধী মহাকবি তুলসীদাসের বিরচিত রামায়ণ পাঠ করেন। মনুসংহিতা মহাগ্রন্থখানিও পাঠ করেন।

তিনি রাম-নাম জপ করেন। তাঁর ধাই-মা তাঁকে রাম নাম জপ করতে শিখিয়েছেন।

কাবা গান্ধীর নিকট আসেন হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, জৈন, খৃস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক। তখন বৈষয়িক কথা হয়; আবার নানারূপ ধর্ম কথাও হয়। মোহন গান্ধী তাঁদের আলোচনা শ্রবণ করেন। তখন তিনি যেন আলো পান, এবং আলো পান করেন। পবিত্র ভাব প্রাপ্ত হন; পবিত্র ভাবে পরিপ্লুত হন—প্লাবিত হন—ডুবে যান।

গান্ধী এক দিন দেখলেন, এক পাদ্রী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খৃস্ট-ধর্মকথা প্রচার করছেন। গান্ধী শ্রবণ করতে লাগলেন সেই কথা। সেই খৃস্টান পাদ্রীর সেই ধর্মপ্রচার তখন কি রকম হচ্ছে? তিনি হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীদের নিন্দা করছেন।

গান্ধী ভাবলেন, ধর্ম কথার মধ্যে পরনিন্দার কথা কেন? এ তো ধর্ম-প্রচারের নামে অধর্ম প্রচার।

গান্ধী সেই স্থানে আর স্থির হয়ে থাকলেন না, সে স্থান থেকে প্রস্থান করলেন।

॥ গান্ধীর বাবা কাবা পরলোকের আলোকে ॥

গান্ধীজীর বয়স হ'ল বছর ষোল। গান্ধীর বাবা কাবা ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ব্যাধি যেরূপ জীবকে বিদ্ধ করে, ব্যাধি তাঁকে সেইরূপ বিদ্ধ করল।

গান্ধীজী কায়মনোবাক্যে পিতার সেবা করতে লাগলেন।

সেবা করা অতি মহৎ কার্য, এ কথা পৃথিবীর সকল সৎ-মানুষই বলেন, সকল সৎ-গ্রন্থেও বলা হয়।

অনলসভাবে পিতৃসেবা করতে করতে অল্পবয়স্ক গান্ধীর শরীর একদিন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই দেখে, গান্ধীর কাকা তাঁকে বললেন, তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর গিয়ে। গান্ধী, তখন অন্য এক প্রকোষ্ঠে গিয়ে একটু শয়ন করলেন।

একটু কাল পরেই তাঁদের একটি ভৃত্য গান্ধীকে ডাকলেন। তিনি তখনই উঠে প্রকোষ্ঠের বাইরে গেলেন।

তখন অতি কষ্টের কথা তাঁর কর্ণে প্রবেশ করল : তোমার পিতা, ইহলোকের আলোক ত্যাগ করে, পরলোকের আলোকে চ'লে গেছেন।

॥ শ্যামলদাস কলেজে মোহনদাস ॥

গান্ধীজীর বাবা কাবা যখন পরলোকে গমন করলেন, গান্ধী তখন রাজকোট বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী। পরম পূজনীয় পিতার পরলোকগমনে গান্ধীর মন নিদারুণ দুঃখ অনুভব করল। কিন্তু কোনও দুঃখ যদি অন্যান্য কর্তব্যে বাধা দেয়, তা হ'লে সেটা হয় অন্যায়। তাই গান্ধীজী তাঁর অধ্যয়নকে বাধাপ্রাপ্ত হতে দিলেন না।

অতঃপর রাজকোট বিদ্যালয় হতে ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

একাকী আমেদাবাদে গমন ক'রে তাঁকে সেই পরীক্ষা দিতে হয়েছিল।

এইবার গান্ধীজীর উচ্চ-শিক্ষালাভের প্রয়োজন।

ভাওনগরে শ্যামলদাস কলেজে মোহনদাস ভর্তি হলেন। মোহনদাসের বিদ্যাভ্যাস অনলস ভাবেই চলতে লাগল।

কাবা গান্ধীর একজন বন্ধু ছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। গান্ধী-গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর প্রীতির বন্ধন ছিল অকৃত্রিম।

কাবার সেই বন্ধু একদিন গান্ধীদের বাটীর সকলকে বললেন, মোহনদাসকে যদি জীবনে বেশ উন্নতি লাভ করতে হয়, তাহ'লে, তাঁকে বিলেতে যেতে হবে। সেখানে আইন অধ্যয়ন করে ব্যারিস্টার হতে হবে।

ঐ প্রস্তাবটি গান্ধীজীর খুবই মনঃপুত হল।

কিন্তু ঐ প্রস্তাব কার্যে পরিণত হওয়ার পথে বাধা দেখা দিল দুটা—একটা বাধা হল অর্থাভাব; দ্বিতীয় বাধা হল, কালাপানি

পার হয়ে অহিন্দু দেশে গমন করা, তার ফলে, জাত-যাওয়া।—তাই গান্ধী পরিবারের কেউই ঐ প্রস্তাবে সায় দিলেন না।

কিন্তু গান্ধী তো দমে যাওয়ার যুবক নন। তিনি তাঁর পিতৃব্যকে বললেন, অর্থ দিয়ে, আমার বিলাত যাত্রার ব্যবস্থা করে দিন।

কিন্তু জাত যাওয়া সম্বন্ধীয় সংস্কার বশে গান্ধীজীর সেই পিতৃব্য তাঁকে করলেন একটু তিরস্কার। বললেন, বিলাতে যাবি জাত খোয়াতে! সেই কার্যে আমি করব সাহায্য!

গান্ধী তাঁদের পরিচিত এক ইংরাজের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু পেলেন না।

গুণধি অদম্য গান্ধী তখন কি করলেন?

ঐ সময়ের পূর্বেই ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি সংকল্প করলেন, পত্নীর অলংকারগুলো বিক্রয় করবেন; সেই অর্থ দিয়ে বিলাতে বিদ্যালাভের ব্যয় নির্বাহ করবেন।

কিন্তু গান্ধী-জননী পুতুলী বললেন, তুমি বিলাতে যাবে; তার পরে সেখানে মদ খাবে, মাংস খাবে, বিলাসিতায় মগ্ন হবে, তাই তোমাকে বিলাতে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।

মোহনদাস তখন শপথ করলেন তাঁর মাতৃপদ প্রান্তে—"মদ খাব না, মাংস ছোঁব না, বিলাসিতায় মগ্ন হয়ে বিনষ্ট হব না। এইবার, মা, তুমি আমাকে বিলাত যাত্রার অনুমতি দাও।"

গান্ধী তাঁর জননীর অনুমতি প্রাপ্ত হলেন। তিনি তৃপ্ত হলেন।

মোহনদাস গ্রেটবৃটেনে যাওয়ার জন্য বোম্বাইয়ে গমন করলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা তখন তাঁর সঙ্গে।

ভারত মহাসাগরে সেই সময়ে প্রায়ই উঠছিল ঝড়, প্রাণান্তকর। তাই গান্ধীজীর তখন অর্ণবযানে আরোহণ করা হয়ে উঠল না।

তাঁর অগ্রজ তখন তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাদি তাঁদের একজন ভগ্নীপতির নিকটে রাখলেন, তারপর অন্যত্র চলে গেলেন।

এদিকে হল কি, ধনিকনন্দন গান্ধী অহিন্দু দেশে যাচ্ছেন, এই কথা শ্রবণ করে, বণিক্-সমাজ মনে করলেন, সর্বনাশ! 'মোহনদাস করবে নিজের জাত-নাশ! তার পরে, আমাদের সঙ্গে মিশে আমাদের জাতি-ধর্মও ফেলবে একেবারে পিষে'!

'বণিক-সমাজ গান্ধীকে বাধা দিলেন। ঐ অবস্থা দর্শন করে, গান্ধীর পূর্বোক্ত সেই ভগ্নীপতি বললেন, তুমি সমাজ-বিরুদ্ধ কর্ম করতে যাচ্ছ। আমি তোমাদের টাকা এখন তোমাকে প্রদান করব না।

মোহনদাস গান্ধী তখন তাঁদের অন্য এক আত্মীয়ের নিকট হতে কিছু পরিমাণ অর্থ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর হৃদয়ে যেন আনন্দের বীণ বেজে উঠল।

গান্ধীজী বিলাতযাত্রী জাহাজে আরোহণ করলেন। সে হচ্ছে ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮ খৃস্টাব্দ। তখন তাঁর সঙ্গী হলেন চুনাগড়ের একজন উকিল। তাঁর নাম ত্র্যম্বক রায় মজুমদার। তিনিও ব্যারিস্টার হওয়ার জন্যে বিলাত যাত্রী হয়েছিলেন।

সমাজের বাধা, পরিবারবর্গের বাধা, অর্থাভাবের বাধা ইত্যাদি বিদলিত করে, গুণধি গান্ধী, বিদ্যার্থী হয়ে হলেন বিলাতযাত্রী।

বোম্বাই বন্দর হতে জাহাজ চলল বিলাতের পথে।

॥ অর্ণবে অর্ণবযান ধাবমান ॥

পরবর্তীকালে অনেকে যাঁকে বলতেন 'গান্ধী মহারাজ', বিলাত-যাত্রী জাহাজ সেই তাঁকেই পেয়েছে নিজের বুকে আজ।

তাই কি জাহাজ সাগর-তরঙ্গ-রঙ্গে বারংবার তুল্ছে, নৃত্য করছে আজ! চার দিকে আকাশ; ঊর্ধ্বে আকাশ; প্রবলবেগে বইছে বাতাস। কখনও সূর্যাভাস, কখনও শশীভাস! সে এক অপূর্ব দৃশ্যের বিকাশ।

অর্ণবযানে তখন অনেক যাত্রী। কিন্তু ভারতীয় কেবলমাত্র দুইজন—জুনাগড়ের ত্র্যম্বক রায় মজুমদার এবং মোহনদাস করমচাঁদ।

যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই অনেকের কাছ ঘেঁষেন, অনেকের সঙ্গে মেশেন। কিন্তু মোহনদাস করমচাঁদ কি করেন? তিনি থাকেন একা একা; বাক্যালাপ, সখ্যালাপ কাহারও সঙ্গেই বড় হয় না। কারণ মোহন কথা ক'ন অল্প, তেমন পছন্দ করেন না খোসগল্প। তাই মিশতে ও ঘেঁষতে পারেন না কারও সঙ্গে।

আহারেও তাঁর একটু অসুবিধা। কারণ তিনি তো মাতৃচরণে শপথ করেছেন—আমিষ ছোঁবেন না, খাবেন না।

অর্ণবযান অগ্রসর হচ্ছে। বন্দরে বন্দরে ভিড়ছে; যাত্রী নামছে; যাত্রী উঠছে।

নানা দেশের লোকের নানারকম হাঁকডাক-বাক্, সে সব শুনলে, লাগে তাক। কেউ বাজায় বাঁশি, কেউ হাসে হাস্নাহানা হাসি; কেউ কেউ দাঁড়ায় পরম প্রিয়জনের পাশাপাশি।

শেষ হয়ে এল মাস সেপ্টেম্বর। শরৎকালের অম্বর পরিধান করেছে চমৎকার চাঁদিনীচেলি অম্বর।

জাহাজ পৌঁছে গেল এল্‌বিয়নের বা ইংলণ্ডের সাউদাম্পটন বন্দরে। আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিলাতে-আগত যাত্রীদের হৃদয়-কন্দরে।

ভারতের সুসুত, কাবা-পুতুলীর পুত্র মোহনদাস করমচাঁদ, হৃদয়ে ধারণ ক'রে বিপুল বিদ্যালাভের সাধ, অবতরণ করলেন কূলে।

তখন কি ভাবের বশে তার হৃদয় উঠল দুলে ?

বিদ্যা-অর্থ-যশ-আশ-উচ্ছ্বাস অনুভব করলেন কি মোহনদাস ?

॥ চাই না হতে বিলাতী বাবু ॥

ইংল্যাণ্ড দ্বীপের বিদ্যাদীপপ্রার্থী মোহনদাস গান্ধী অবস্থান-স্থান গ্রহণ করলেন ব্যয়বহুল ভিক্টোরিয়া হোটেলে।

পরবর্তীকালে সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল যাঁর পরিচয়, সেই গান্ধীর সঙ্গে তখন ছিল চারিখানি পরিচয়পত্র। তন্মধ্যে একখানি ছিল ডাঃ প্রাণজীবন মেহতার নিকটে প্রদত্ত। প্রাণজীবন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে, মোহনদাস হোটেল পরিত্যাগ ক'রে, স্থান গ্রহণ করলেন এক গৃহস্থের ঘরে।

কিন্তু গান্ধীজী স্বল্পভাষী, নিরামিষাশী বলে, সেখানে নানারকম অসুবিধা তাঁকে যেন বিদ্ধ করতে লাগল। তিনি মাঝে মাঝে হোটেলে যেতে লাগলেন, পেট পূর্ণ করে নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ করতে লাগলেন।

অনেকেই ঐ সময়ে গান্ধীকে বললেন, নিরামিষ ছাড়, আমিষ ধর। তা না হলে, দুঃখ পেতে হবে ঘোরতর।

কিন্তু গান্ধীজীর শপথ তাঁকে পথচ্যুত হতে দিল না। তিনি আমিষে কিছুতেই আসক্ত হলেন না।

বিলাতী বিদ্যার্থীজনের পক্ষে বিলাতীবাবু হয়ে ওঠা দরকার,—এই পরামর্শ যুবক গান্ধীকে অনেকেই দিলেন অনেকবার।

সেই পরামর্শ শেষ পর্যন্ত, গান্ধীজীর হৃদয় করল স্পর্শ। বিলাতীবাবু হওয়ার সাধ ভেঙে দিতে চাইল তাঁর ভারতীয়তার বাঁধ।

গান্ধীজী বিলাতে প্রচলিত পোষাক-পরিচ্ছদে বেশ ক'রে বিভূষিত হতে লাগলেন। চুলছাঁটা, টেরি কাটা, শোয়া-বসা-হাঁটা বিলাতী ধরণে করতে লাগলেন। টুপি ও নেক্‌টাই তখন তাঁর যেন সর্বদাই চাই। নাচ-গানও শিক্ষা করতে চাইলেন। নৃত্য-গীত-বাদ্য বিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে গেলেন। একটি বেহালা ক্রয় করলেন। বাজনা শেখায় যেন বিভোর হতে লাগলেন। শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন এক শিক্ষিকার সমীপে।

ফরাসী ভাষা না জানা থাকলে, পাশ্চাত্ত্য দেশে অনেক ক্ষেত্রেই পিছনে পড়ে থাকতে হয়। তাই ফরাসী ভাষা শিক্ষায় দীক্ষা গ্রহণে উৎসুক হলেন। ফরাসী ভাষায় বক্তৃতাদান শিক্ষা করার সাধও তাঁকে যেন একটু ব্যাকুল করে তুলল।

ভারতের কূল হতে দূরাগত গান্ধী ক্রমেই যেন অকূলে ভেসে যাওয়ার উপক্রম করলেন।

কিন্তু বিলাতের বেল নামক একজন খাঁটি মানুষ ভারতসুত গান্ধীর ঐ ভেল ভাব দর্শনে, একদিন তাঁকে বললেন, হে ভারতীয়, তুমি কি হতে চাও বিলাতীয় ?—তোমার কি তা হওয়া উচিত ?

ঐ সখ্য-বাক্য শ্রবণ করা মাত্রই যুবক গান্ধী বুঝলেন, তিনি যাকে মনে করেছেন তাঁর হিত, সেটা, প্রকৃতপক্ষে, তাঁর অহিত।

গান্ধীজীর মনে তখন উপস্থিত হল বিষাদ্। উবে গেল, বিলাতী বাবু হওয়ার সাধ। সেই ভারত-সুত বিলাতী বাবু হওয়ার বিরুদ্ধে নিজের মনকে করে তুললেন মজবুত।

বিলাতী বাবু হতে গিয়ে, এত দিন ব্যয়-বন্যায় তাঁর কত অর্থই

ভেসে গিয়েছে! এই বার তিনি তাঁর ব্যয়কে সংযত করলেন। কেবল মাত্র বিদ্যাধনার্জনে মনোযোগী হলেন। একখানি ঘর ভাড়া করে, সেখানে নিজে রন্ধন করে আহার করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে, গান্ধী হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, মুসলীম ধর্মশাস্ত্র, খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র কিছু কিছু অধ্যয়ন করে ফেলেছেন। ধর্মই যে তাঁর জীবনের ধর্ম!

গান্ধীজী বিলাতে প্রবেশিকা বা মাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিলেন। কিন্তু ল্যাটিন ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারায়, উত্তীর্ণ হতে পারলেন না প্রবেশিকা পরীক্ষায়। তার পরের বারে তিনি আবার চেষ্টা করে চলে গেলেন পরীক্ষা নদীর পরপারে—উত্তীর্ণ হলেন।

তারপরে যথাকালে, মোহনদাস ব্যারিস্টারী পরীক্ষা দিলেন, উত্তীর্ণ হলেন। সে দিনটা হচ্ছে ১৮৯১ খৃস্টাব্দের ১০ই জুন।

গান্ধীজীর বিলাতে অবস্থান কালের এক দিনকার একটি ঘটনা।

গান্ধীজী একটি মেয়ের সঙ্গে একদিন এক পর্বত-পর্যটনে গিয়েছেন। দুই জনেই বেশ একটু উচ্চ স্থানে উঠেছেন। তার পরে, সেই মেয়েটি অবতরণ করলেন অনায়াসে। কিন্তু নামতে গিয়ে; যুবক গান্ধীর হল মহা মুশকিল। তাই দেখে সেই বিলাতী তরুণী হেসে উঠল খিল খিল। তার পরে, বারেক বসে, বারেক দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গান্ধীজী সেই পাহাড় থেকে করলেন অবতরণ। সেটা যেন হল তখন তাঁর পক্ষে ছোট একটা রণ!

গান্ধীজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ১০ই জুন। তার পরেই স্বদেশ অভিমুখে -যাত্রা করলেন ১২ই জুন। স্বদেশপ্রীতি গীত তাঁর হৃদয়ে করতে লাগল গুন গুন, গান্ধীকে নিয়ে ইংলণ্ড থেকে ছাড়ল একখানি অর্ণবযান। তার নাম 'আসাম'। 'আসাম' জাহাজের যাত্রী পরবর্তী কালের ভারত-ভানু তখন ভারত-ভাবে বিভোর।

॥ শ্বেতদ্বীপ প্রবাসী ভারতের দীপ ॥

শ্বেতদ্বীপপ্রবাসী ভারতের দীপ, জলযানে বিরাজমান হয়ে, চলে আসতে লাগল ভাতির দেশ ভারতে।

বর্ষকাল। সমুদ্র উত্তাল। তার তখন তুমুল তরঙ্গ তাল।

প্রবল বেগে প্রবহমান বাতাস বিশ্ব যেন করতে চায় বিনাশ! মেঘের গর্জন, বৃষ্টি বর্ষণ সে সব রোমহর্ষণ।

বিদ্যুতের অট্টহাস যেন বিদীর্ণ করছে আকাশ! আকাশের যেন নাভিশ্বাস উপস্থিত।

কিন্তু গুণধি গান্ধী তখন আনন্দী। তিনি বিদ্বান হয়েছেন; সংযমেও শোভমান রয়েছেন।—বিলাত তাঁর ভারতীয়তাকে মাত করতে পারেনি।

কিছু দিন পরে অর্ণবযান এল এডেন বন্দরে।

তখন কোন কোন যাত্রীর নিকট হয়ত বোধ হল, এডেন যেন ইডেন!

এইবার যানখানি যাত্রা করল ভারত অভিমুখে।

ঝড় আরম্ভ হল। মত্ত হয়ে উঠল যেন এক অসুর। তার লম্ফে-ঝম্পে-আস্ফালনে যেন ধ্বংসের সুর। অনেক যাত্রীরই বুক করতে লাগল দুড়দুড়।

উর্মির উদ্দাম রঙ্গ যাত্রীদের করতে লাগল শান্তিভঙ্গ। অনেকরই মাথা ঘোরায়, বমি এসে যায়। আশঙ্কায় হিয়া করে হায়-হায়।

কিন্তু শীর্ণকায় গান্ধীর অবস্থা তখন কি রকম? দুরবস্থা, না, সুস্থাবস্থা?

সুস্থাবস্থা। মোহন দাসের মাথাও ঘোরায় না; বমিও আসেনা। তাঁর চিত্ত তখন তরঙ্গ-নৃত্য-তালে-তালে যেন নৃত্য করি তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবনের ভাব-চিত্ত যেন আহরণ করে !

গান্ধী জাহাজের ডেঁকের উপর দণ্ডায়মান হন, পদচারণা করেন। মনে মনে হয়ত কিছু রচনাও করেন।

কোথায় ভারতের কূল? কোথায় ভারতের কূল?—এই ভেবে ভেবে, গান্ধী চিত্ত হয় আকুল, হয় ব্যাকুল।

মাঝে মাঝে দেখেন, ফুল ভেসে যায় জলে, যেন পরম কুতূহলে !

ভেসে যায় কাঠ-খড়; মাঝে মাঝে মাথা তোলে জলচর হাঙ্গর।

অতিক্রম করে সাগর দুস্তর, জাহাজ হয় অগ্রসর ভারতের কূল অভিমুখে। ভাবোল্লাস ফুটে ওঠে গান্ধীজীর মুখে; আনন্দ তরঙ্গ রঙ্গে মেতে ওঠে গান্ধীজীর বুকে।

॥ ভারতের ছেলে এল ভারতের কোলে ॥

গুণধি গান্ধীকে বুকে নিয়ে বিলাতী জাহাজ এসে স্পর্শ করল বোম্বাই বন্দর ; করল সেখানে নোঙ্গর।

সাগর-কূলে বোম্বাই। বিশাল ব্যোম যেন তার বড় ভাই। গান্ধী তখন দর্শন করলেন, তাঁকে গ্রহণ করবার জন্য জাহাজঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর বড় ভাই।

কিন্তু বড় ভাইয়ের মুখে আনন্দের ভাব নেই। কেন নেই ?

তখন গান্ধীজীর বড় ভাইয়ের মুখ হতে বাক্য বিনির্গত হল না ; তাঁর নয়নদ্বয় হতে বিনির্গত হল অশ্রু।

কেন সেই অশ্রুপাত ?

অনুজ গান্ধী তাঁর অগ্রজের নিকট হতে শ্রবণ করলেন, তাঁর ইংলণ্ডে অবস্থানকালে, তাঁদের জননী পুতুলী বাঈ পরলোকে গিয়েছেন চলে।

যে গান্ধীকে তাঁর বাল্যে জীবিত রেখেছিল ও পরিপুষ্ট করেছিল জননীর দুগ্ধধারা, সেই জননীর পরলোকগমন বার্তা শ্রবণে, গান্ধীর নয়নে নেমে এল অশ্রুধারা।

তাঁর হয় তো মনে হল, এখন আমি যে গৃহে গমন করব, সে গৃহ তো এখন অন্ধকার ;—আমার জননীই তো ছিলেন দীপ সেথাকার।

শ্বেতদ্বীপ থেকে সমাগত ভারতের ভাবী দীপ তাঁদের গৃহ দীনহীন ব'লে গণ্য ক'রে যেন দৈন্যগ্রস্ত হয়ে পড়লেন।

॥ গৃহে আগমন ও নিগ্রহ লাভ ॥

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বিলাতে গিয়ে, বিলাসিতায় মগ্ন হননি। তিনি সেখানে বিদ্যা অর্জন করেছেন।

তথাপি, তিনি যখন সেই বিদেশ থেকে তাঁর এই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন সমাজের অনেকেই অভিমত প্রকাশ করলেন: মোহনদাস কালাপানি পার হয়েছেন, অতএব তাঁর জাত গিয়েছে—আমাদের সমাজে আমরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারি না।

গান্ধীর ঐরূপ বিরুদ্ধতা করার দলের মধ্যে, তাঁর ভগ্নীপতির বাটীর লোক ছিলেন; তাঁর শ্বশুরবাটীর লোকও ছিলেন। তাঁরা এবং তাঁদের মতাবলম্বী অন্যান্যরা গান্ধীজীর সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে আহার ইত্যাদি করতে সম্মত হলেন না; কিন্তু গুপ্তভাবে গান্ধীজীর সঙ্গে আহার ইত্যাদি করতে তাঁরা অনিচ্ছুক হলেন না।

কিন্তু পরবর্তীকালের মহান সত্যাগ্রহী গান্ধী সেই সময়ে বললেন, 'গোপনে সামাজিক মেলামেশা করা—সে তো কাপুরুষতা—সে তো মিথ্যাচার। সে কর্ম করা এই করমচাঁদের কর্ম নয়।'

কিন্তু, ঐ সময়ে, ন্যায়সংগত ভাবে কর্ম করার মতো মানুষও সমাজে ছিলেন। তাঁরা গান্ধীকে প্রকাশ্যভাবে সমাজে গ্রহণ করলেন।

কেহ কালাপানি পার হলে, তাঁর জীবন যে আলা হয়ে উঠতে কোনই বাধা হয় না, এটা তাঁরা বুঝতেন।

॥ কস্তুরীবাঈ ॥

কস্তুরীবাঈ, এই নামটি আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। তাঁর প্রতিকৃতিও দেখতে পাই।

কে এই কস্তুরী বাঈ ?

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পত্নীর নাম কস্তুরীবাঈ গান্ধী।

'কস্তুরী' নামক বস্তুটি অতিশয় সুগন্ধী। কস্তুরীবাঈ গান্ধীও ছিলেন অতিশয় গুণগন্ধি।—বহুগুণে অলংকৃতা ছিলেন সেই মহিলা। নববর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

তাঁদের সেই বয়সে—তাঁদের সেই বাল্যকালে—তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

সেইরূপ বাল্যবিবাহ তখন সমাজে খুবই প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনে বাল্যবিবাহ অসংগত কার্য বলে গণ্য হত না।

পরবর্তীকালে, গান্ধীজী হয়েছিলেন বাল্যবিবাহের বিরোধী।

কস্তুরীবাঈ, অবলা হয়েও, অবলা ছিলেন না—তিনি ছিলেন খুবই সাহসী, যেন একখানি অসি! তিনি ভূতের ভয়ে ভীত হতেন না; সাপ দেখলেই, "বাপ! বাপ!" ক'রে পলায়ন করতেন না; দস্যু-তস্কর তাঁকে ভীত করতে পারত না।

করলে ভয়, জীবনে ধ'রে ক্ষয়। না করলে ভয়, জীবনে লাভ হয় জয়;—উন্নত মানুষের এই ভাবটি কস্তুরীর মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

রাত্রে অন্ধকারে ঘরের বাইরে যেতে কস্তুরীবাঈ কোন সঙ্গী অন্বেষণ করতেন না;—তাঁর সরল মনোভাবটিই ছিল তাঁর সঙ্গী।—সেইটিই তাঁর সঙ্গীন অস্ত্রের কর্ম করত।

॥ ধড়িবাজ ইংরাজ ॥

ব্যারিষ্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, বিদেশ থেকে স্বদেশে আসার পর রাজকোটে কিছু দিন অবস্থান করলেন। তারপর ব্যারিষ্টারের আইন ব্যবসায় আরম্ভ করলেন বোম্বাই শহরে। তাঁর বাসস্থান থেকে বিচারালয় পর্যন্ত প্রায় একঘণ্টার পথ। রোজই তিনি পদব্রজে বিচারালয় যাতায়াত করতেন।

প্রথম কয়েক মাস, মামলা করার জন্য কেউই তাঁকে ব্যারিস্টার রূপে নিযুক্ত করলনা।

কিছুকাল পরে একটি মামলা তিনি পেলেন। সেই মামলাকে বলা হয় 'মমীবাঈয়ের' মামলা।

গান্ধীজী পারিশ্রমিক গ্রহণ করলেন ত্রিশ টাকা। দাঁড়ালেন আদালতে বিচারকের সম্মুখে অন্যান্য উকিল ব্যারিস্টারদের মধ্যে।

গান্ধী তাঁর মক্কেলের পক্ষ হয়ে, কথা বলবার চেষ্টা করলেন বার বার—অনেক বার। কিন্তু কথা বলতে পারলেন না একবারও। তাঁর লাজুক স্বভাব হল তাঁর ব্যারিস্টারি করার অন্তরায়। তাঁর অন্তর যেন কাঁপতে লাগল।

শেষপর্যন্ত, গান্ধীজী কি করলেন ?

বিচারালয় হতে বাইরে চলে গেলেন। মক্কেলের প্রদত্ত পারিশ্রমিক মক্কেলকে প্রত্যর্পন করলেন।

অনেকে গান্ধীজীকে উপহাস করল।

পরবর্তী কালের গান্ধী "মহারাজ" আবার এলেন রাজকোটে। ক্রমে ক্রমে ছোট-খাট দু চারটি মামলার কাজ পেতে লাগলেন। প্রতিমাসে শ' তিনেক টাকা রোজগার হতে লাগল।

গান্ধীজীর বড় ভাই ছিলেন রাজকোটের উকিল। ইংরাজের অধীনে তখনকার ভারতে দেশীয় রাজ্যগুলোর জন্যে পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন কয়েকজন ইংরেজ। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন খুবই ধড়িবাজ।

এক পলিটিক্যাল এজেন্ট এক ধড়িবাজ ইংরেজ একবার গান্ধীজীর সেই উকিল ভ্রাতার বিরুদ্ধে এক মিথ্যা অভিযোগ প্রকাশ করলেন : তিনি কথিয়াবাড়ের রাজাকে অসংগত পরামর্শ দিয়েছেন।

ঐ যে ধড়িবাজ ইংরেজ, গান্ধীজীর বিলাতে অবস্থান কালে তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর আলাপ পরিচয় ছিল।

সেই বিষয় স্মরণ করে গান্ধীজী গেলেন সেই ইংরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

সাক্ষাৎ হল কিন্তু সেই ধড়িবাজ ইংরাজ ভারতীয় গান্ধীর সঙ্গে করলেন এরূপ দুর্ব্যবহার, যে সেই ব্যবহার যেন এক প্রকার প্রহার।

গান্ধীজী অপমানিত হলেন। ফিরে এলেন। তার পর একখানি পত্রে সেই ধড়িবাজ ইংরাজকে লিখলেন : 'আপনি আপনার অন্যায় কার্যের জন্য আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তা না হলে, আমি আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করব।'

সেই ধড়িবাজ ইংরাজ গান্ধীজীর সেই পত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করলেন।

গান্ধীজী তখন মনে মনে ভাবলেন, পরাধীনতার অন্ধকারে পতিত ভারতকে ভাসমান অর্থাৎ আলোকযুক্ত করে তুলতে হবে। তা না হলে, বৃথা জীবন ধারণ করে কি হবে!

॥ বিদ্বেষের দেশ ॥

তৎকালে একটি বাণিজ্য সংস্থা ছিল। তার নাম 'দাদা আবছুল্লা এণ্ড কোম্পানী'। পোরবন্দরে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ন্যাটালে সেই কোম্পানীর কারবার ছিল।

শেঠ তৈয়ব হাজি খাঁ মহম্মদ নামক একজন ব্যবসায়ীর সংস্থা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়ায়।

ঐ উভয় ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রচুর টাকার বিষয়াদি নিয়ে একটা মামলার সৃষ্টি হয়েছিল।

দাদা আবছুল্লা এণ্ড কোম্পানী তাঁদের সেই মামলা পরিচালনার দায়িত্ব দান করতে চাইলেন ব্যারিষ্টার গান্ধীজীর হাতে। তাঁরা বললেন, আমরা আপনাকে এই কার্যের জন্য একশত পাঁচ পাউণ্ড অর্থ প্রদান করব এবং জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে যাতায়াতের ও আহারাদির জন্য যাবতীয় অর্থও প্রদান করব।

গান্ধীজী সেই মামলা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যাত্রা করলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। তখন ১৮৯৩ খৃস্টাব্দ, এপ্রিল মাস।

ন্যাটালে সাগরতীরে একটি সুন্দর বন্দর। নাম ডার্বান। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে অর্ণবযান সেই বন্দরে উপনীত হল।

শেঠ আবছুল্লা জাহাজ ঘাটে উপস্থিত ছিলেন গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য।

বহু ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয়ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন নিজ নিজ সম্পর্কিত যাত্রীকে স্বাগত জানাবার জন্য।

পাগড়ি পরিহিত গান্ধীজী লক্ষ্য করলেন, এমন একটা হাব ভাব রয়েছে ইয়োরোপীয়দের চোখে মুখে, যা থেকে বোঝা যায়, ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ রয়েছে তাঁদের বুকে।

গান্ধীজীর যেন মনে হল, এ তো বিদ্বেষের দেশ।—মানুষ যেন মানুষের বন্ধু নয় বিদ্বেষের বন্দুক !

বিচারালয়ে গান্ধীজী

গান্ধীজী দু এক দিন একটু বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

তার পরে শেঠ আবদুল্লা গান্ধীজীকে নিয়ে গেলেন ডার্বানের বিচারশালায়।

যথাসময়ে ম্যাজিস্ট্রেট এলেন আদালতে। পাগড়ি—পরা গান্ধীজীর উপর তাঁর দৃষ্টি পতিত হল।

গান্ধীজী দেখলেন, সেই দৃষ্টি মিষ্টি দৃষ্টি নয়, সে দৃষ্টি যেন বিষ দৃষ্টি।

ম্যাজিস্ট্রেট গান্ধীজীর প্রতি আদেশ করলেন, তাঁর পাগড়ি পরিত্যাগ করবার জন্য।

পরবর্তীকালের সত্যাগ্রহী গান্ধী সেই নিগ্রহ মেনে নিতে সম্মত হলেন না।

সেই বিচারশালায় সেটা যেন হ'ল তাঁর পক্ষে একটা বিছার কামড় ! তিনি বিচারকক্ষ হতে বেরিয়ে গেলেন।

শেঠ আবদুল্লার নিকট থেকে তিনি অবগত হলেন, সেখানে ভারতীয়দের শিরে শিরস্ত্রাণ পরিধান করতে দেওয়া হয় না।

ভারতীয়দের জাতীয়তার প্রতি ঘা দেওয়ার সেই ঘটনাটা বর্ণনা ক'রে ভারতভাস মোহনদাস গান্ধী সংবাদপত্রে পত্র প্রেরণ করলেন।

সেই পত্রের স্পর্শে, সংবাদপত্রের আসর যেন সরগরম হয়ে উঠল। নানা জনের নানা রকম অভিমত সংবাদপত্রে এসে জুটল। কেউ কেউ গান্ধীজীকে অভিহিত করতে লাগলেন "অবাঞ্ছিত অতিথি" ব'লে। অল্পকালের মধ্যেই গান্ধীজীর নাম পরিচিত হয়ে পড়ল দক্ষিণ আফ্রিকায়।

॥ বর্ণবৈষম্যের মসিবর্ণ ॥

গান্ধীজী যে মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন, সেই মোকদ্দমার বিচার হওয়ার কথা ছিল ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়ার এক বিচারশালায়।

গান্ধীজী, একদিন, প্রিটোরিয়ায় যাওয়ার জন্য, রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর টিকিট নিয়ে ডার্বান থেকে রেলগাড়ীতে আরোহণ করলেন। গাড়ী চলল।

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে ন্যাটালের রাজধানী মরিজবার্গ রেলস্টেশনে জনৈক শ্বেতাঙ্গ রেলগাড়ীর সেই কক্ষে প্রবেশ করল, যে কক্ষে গান্ধীজী অবস্থান করছিলেন। সেই শ্বেতাঙ্গ, অশ্বেতাঙ্গ গান্ধীজীকে দেখে, অনুরক্তি বোধ করল না, বোধ করল বিরক্তি। সে তখনই রুক্ষ মুখে সেই কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

পরক্ষণেই, গান্ধীজী দেখলেন, সেই শ্বেতাঙ্গ এল, আর এল কয়েকজন রেলকর্মী। একজনে গান্ধীজীকে বলল, আপনি অন্য কোন কক্ষে চ'লে যান। এই কক্ষ ত্যাগ করুন।

গান্ধীজী সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিজের ন্যায়সংগত অভিমত প্রকাশ করলেন। বললেন, আমি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। ডার্বান থেকে আমাকে এই কক্ষেই অবস্থান করতে দেওয়া হয়েছে।

অন্যায় পথাবলম্বী সেই শ্বেতাঙ্গ রেলকর্মী, ন্যায় পথাবলম্বী অশ্বেতাঙ্গ গান্ধীর মুখে ন্যায়সংগত কথা শ্রবণ ক'রে, ক্রুদ্ধ হল।

বলল, আপনাকে এই প্রথম শ্রেণীর কক্ষে অবস্থান করে গমন করতে দেওয়া হবে না। আপনি, নমনীয় ভাব অবলম্বন করে, এই কক্ষ থেকে নামুন। না হলে, পুলিশ আসবে, আপনাকে নামাবে।

ন্যায়-মার্গাবলম্বী গান্ধী অন্যায়ের নিকট অবনতশির হলেন না। তিনি দৃঢ়স্বরে বললেন, আমি স্বেচ্ছায় এই কক্ষ ত্যাগ করব না—অন্যায়ের নিকট ন্যায়কে নতশির হতে দেব না।

অপর পক্ষ ব'লে উঠল, তাহলে আমরাও ছাড়ব না।

একটু পরেই, ওরা নিয়ে এল একজন পুলিশকে। সেই পুলিশ মধ্যম পাণ্ডব ভীমের মতো ভীমকায়।

সেই পুলিশ গান্ধীজীর হাত ধরল, টান মারল, গান্ধীজীকে সেই কক্ষ থেকে নামিয়ে তবে ছাড়ল। গান্ধীজীর মালপত্র নিক্ষিপ্ত হল যত্রতত্র সেই ব্যক্তির ক্ষিপ্তবৎ আচরণে।

সারাজীবন, গান্ধীজীর ধ্যেয় ছিল অভিরাম রাম। অন্ধকারের বিরুদ্ধে তাঁর শুরু হল আলোর সংগ্রাম।

তখন শীতকাল। শীত প্রবল। গান্ধীজী রেল স্টেশনের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তাঁর মন বিশ্রাম লাভ করল না। মন বলতে লাগল, এই যে বর্ণবৈষম্যবোধ-বিষ, এই বিষ বিশ্বকে বিষাক্ত করছে। এই বিষকে বিশ্ব হতে বিদায় করবার চেষ্টা করাই হবে আমার কর্তব্য।

রাত কাটল। ভোরের আলো ফুটল।

গান্ধীজী রেলপথের কর্তৃপক্ষের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করলেন। সব ঘটনা জানালেন, প্রতিকার চাইলেন। কিন্তু পথের দিকে চেয়ে থাকাই সার হল—কোন প্রতিকার এল না। কারণ হীনচেতাদের কর্তৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি ঐরূপ ব্যবহার যখন তখনই করা হত।

গান্ধীজী অপরাহ্ন বেলায় এক রেলগাড়ীতে আরোহণ করলেন, প্রিটোরিয়ায় চললেন।

পথে চার্লস টাউন রেলস্টেসনে অবতরণ করে, কিঞ্চিৎ পথ অশ্ব-শকট যোগে অতিক্রম করতে হত। কিন্তু অশ্ব শকটেও শ্বেতাঙ্গদের হৃদয়ের নিঃস্ব ভাবের দৃশ্য প্রকট হল। শকটের চালকের পার্শ্বে উপবেশন ক'রে পর্যটন করার উপযুক্ত টিকিট গান্ধীজীর ছিল। কিন্তু শকটের কণ্ডাক্টর শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি গান্ধীজীর সেই আসন দখল করল।

সেই খল শ্বেতাঙ্গ অশ্বেতাঙ্গ গান্ধীকে বসতে দিল বাইরে। গান্ধীজী বসলেন। একটুকাল পরে, সেই খল শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি গাড়ীর ড্রাইভারের পদপ্রান্তে একটা ময়লা চটের উপর গান্ধীজীকে অবস্থান করতে বলল। কারণ সেই খলের তখন চুরুট খাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল।

প্রথম শ্রেণীর টিকিটধারী গান্ধী ঐরূপ আচরণ সহ্য করতে সম্মত হলেন না। তৎক্ষণাৎ তাঁর দেহের উপর পড়তে লাগল ঘুষির পর ঘুষি। সেই দোষী শ্বেতাঙ্গটা গান্ধীজীকে সেই গাড়ী থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করল।

গান্ধীজী তখন গাড়ীর হাতল হাত দিয়ে ধরে ঝুলতে লাগলেন। কিন্তু সেই দুর্বৃত্ত শ্বেতাঙ্গটা তখনও গান্ধীজীর উপর পীড়ন চালাতে লাগল।

ঐ সময়ে একজন ইংরেজ সেই কণ্ডাক্টরকে দৌরাত্ম্য হতে বিরত করলেন।

সেই দুরাত্মা তখনও একটা সর্পবৎ অবস্থান ক'রে গান্ধীকে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল।

পথে পথে ঐরূপ অপ্রীতিকর ব্যবহার প্রাপ্ত হয়ে, গান্ধীজী পৌঁছলেন প্রিটোরিয়ায়। কিন্তু হোটেলে আহার ও অবস্থান করা তাঁর পক্ষে হল এক বিষম দায়।

শ্বেতাঙ্গদের হোটেল অ-শ্বেতাঙ্গ গান্ধীজীর প্রতি উদ্যত করল অসভ্যতার শেল।

না, না, না, এখানে তোমার স্থান হবে না!—এই কথাই শ্রবণ করলেন তিনি শ্বেতাঙ্গ হোটেল মালিকদের দুর্মুখ মুখ থেকে।

শেষ পর্যন্ত, আমেরিকার এক শ্বেতাঙ্গ সহৃদয় ব্যক্তি এক রাত্রির জন্য গান্ধীজীকে স্থান দানে সম্মত হলেন। কিন্তু ভোজনাগারে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে একত্র আহার করার অধিকার প্রথমে লাভ হল না। তবে একটুকাল পরে, সে সুবিধাও গান্ধীজী লাভ করলেন। পরবর্তী দিবসে, দাদা আবদুল্লার পক্ষের আইনজীবী সদাশয় এ, ডব্লিউ বেকারের চেষ্টার ফলে, গান্ধীজী অর্থ প্রদান ক'রে, রুটি বিক্রেতা এক দরিদ্রা নারীর গৃহে স্থান লাভ করলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শাসকদের অশ্বেত-হৃদয়ের সাহারা-চেহারা গান্ধীজী সেই বার খুবই দর্শন করলেন।

॥ শ্বেতাঙ্গ সর্পসন্নিভ ॥

শ্বেতাঙ্গদের সর্পভাবের পরিচয় গান্ধীজী আরও পেতে লগলেন।

রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে ভারতীয়দের চলতে দেওয়া হয় না; রাত্রি নয়টার পরে ভারতীয়দের থাকতে হয় ঘরে—রাস্তায় চলার অধিকার নেই; চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক, শ্বেতাঙ্গদের অধীনে কর্ম করার কালে, পড়েন যেন শয়তানের জালে। লাভ করেন পীড়ন, নির্যাতন।

Natal mercury (ন্যাটাল মার্কারি) নামক সংবাদপত্র থেকে গান্ধীজী অবগত হলেন, সেখানকার ভারতীয়রা যাতে আইন সভায় নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করতে না পারেন, সে জন্য আইনও বলবৎ হতে চলেছে।

শ্বেতাঙ্গদের বর্ণ বিদ্বেষের মসিবর্ণ গান্ধীজী ভারতীয়দের প্রতি ঘা দেওয়ার আরও কোন কোন ঘটনায় বিশেষভাবেই দেখলেন।

একদিন গান্ধীজী প্রাতঃকালে রাষ্ট্রপ্রধান ক্রুগারের বাসভবনের সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়ে গমন করছিলেন। তৎক্ষণাৎ এক বুয়ার প্রহরী শূয়ারবৎ ছুটে এল, গান্ধীজীকে পদাঘাত করল, ফুটপাথ হতে পথে নামিয়ে দিল। ঐ সময়ে বোট্‌স্ নামক একজন শ্বেতাঙ্গ, তাই দেখে, সেই শূয়ারবৎ বুয়ারকে বিস্তর তিরস্কার করলেন।

একদিন, শ্রীবাঁল স্থন্দরম্ নামক একজন ভারতীয় শ্রমিক, তাঁর শ্বেতাঙ্গ মনিবের হস্তে বিস্তর প্রহৃত হয়ে, প্রতিকার প্রাপ্তি আশায়, এলেন গান্ধীজীর সমীপে। ঐরূপ নানা ঘটনা থেকে গান্ধীজী বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলেন সেখানকার শ্বেতাঙ্গরা, আসলে, কত কালো!

ভারতীয়দের প্রতিনিধির আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার অধিকার-ক্ষুণ্ণকারী আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা যাতে অধিক আর অগ্রসর না হয়, সে জন্য গান্ধীজীর উদ্যোগে বহু জনের স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবাদ-প্রকাশক আবেদন পত্র কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হল; কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের দ্বেষ দেশছাড়া হয়ে গেল না,—ন্যায়হীন আইন বলবৎ হয়ে গেল।

শ্রীমান ধীমান গান্ধী তখন সেখানকার আর্ত ভারতীয় ভাইদের স্বার্থ স্বকীয় স্বার্থ এবং পরমার্থ বলে গণ্য করলেন।

১৮৯৪ খৃস্টাব্দের ২২এ মে দাদা আবদুল্লার ভবনে ভারতীয়দের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হল। সেখানে গঠিত হল "ন্যাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস"। শ্রীমান ধীমান মোহনদাস হলেন তার সেক্রেটারি।

মোহনদাস যে মোকদ্দমা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন সে মোকদ্দমা-রূপ হাঙ্গামা উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধু ভাবেই বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সেখানকার বিচারালয়ে ব্যারিষ্টারি করার জন্য

গান্ধীজীর আবেদনের বিরোধিতা করল সেখানকার শ্বেতাঙ্গ আইনজীবীরা।

কিন্তু বিচারালয়ের শ্বেতাঙ্গ বিচারক সেক্ষেত্রে ন্যায় বিচারই করলেন—গান্ধীজীকে ব্যারিষ্টারি করার অনুমতি দিলেন।

গান্ধীজী সেইখানে তিন বর্ষকাল অবস্থান করে, নানাভাবে ভারতীয় ভাইদের সেবা ক'রে, হর্ষ প্রদান করলেন, হর্ষ প্রাপ্ত হলেন।

ভারতমোহন মোহনদাস একদিন অর্ণবযানযোগে ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন। চব্বিশ দিবস জাহাজে অবস্থানকালে, তিনি শিক্ষা করতে লাগলেন মাদ্রাজী ভাষা এবং উর্দু ভাষা।

জাহাজ দুলে দুলে সমুদ্রের তরঙ্গের তালে তালে, ভারতের কূলে এল যথাকালে। গান্ধীজী অবনত ভালে ভারতমাতার মৃত্তিকা করলেন স্পর্শ, প্রাপ্ত হলেন হর্ষাতিহর্ষ।

॥ মহাপ্রাণের প্রাণ নাশের পৈশাচিক প্রয়াস ॥

গুণগন্ধী গান্ধীর গুণগন্ধ দক্ষিণ আফ্রিকা হতে ইতিপূর্বেই ভারতে ভেসে এসেছিল। তাই গান্ধীজী, ভারতে আসার পর, সর্বত্র সমাদর লাভ করতে লাগলেন।

বোম্বাইয়ে ফিরোজ শা মেটার সঙ্গে, পুণায় লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এবং গোপালকৃষ্ণ গোখেলের সঙ্গে তাঁর নানারূপ আলোচনা হল। মাদ্রাজে এক মহতী সভায় জনগণ গান্ধীর মুখ থেকে শ্রবণ করলেন বালসুন্দরমের প্রতি বিলাতী বর্বরতার কথা। ভারতের ভাল কুঞ্চিত হল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় মস্তক উত্তোলন করল।

ওর মাস ছয়েক পরে, গান্ধীজী ন্যাটাল হতে এক তারবার্তা পেলেন: সত্বর এখানে আসুন; এখানকার ভারতীয় ভাইয়েরা আপনাকে চান।

ঐ তারবার্তা প্রাপ্ত হয়ে, গান্ধীর প্রাণ করে উঠল আনচান।

গান্ধীজী পত্নী ও পুত্র সহ দাদা আবদুল্লার "কুরল্যাণ্ড" জাহাজ যোগে আবার যাত্রা করলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। ডার্বান উপনীত হলেন ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর।

ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-সর্প তখন মহাপ্রাণ গান্ধীর প্রাণনাশের পৈশাচিক প্রয়াসে মশগুল। শ্বেতাঙ্গ-সর্পদের সেই ষড়যন্ত্র গোপন ছিল না। তাই এটর্নি জেনারেল শ্রীএস্ কম্বের নির্দেশে "কুরল্যাণ্ড" জাহাজ তীরে ভিড়ল না।

তারপর ঐরূপে তেইশ দিন অপেক্ষা করার পর, গান্ধীজী উপকূলে পদার্পণ করলেন। তাঁর পত্নী ও পুত্রদ্বয়কে আলাদা ভাবে শ্রীরুস্তমজীর ভবনে প্রেরণ করা হল। শ্রীলাফ্‌টন নামক একজন

সদাশয় ব্যবহারজীবী গান্ধীজী সহ রাজ পথ দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন।

মহাপ্রাণ গান্ধীর প্রাণনাশের পৈশাচিক প্রয়াসে প্রমত্ত বিলাতী বর্বরেরা তৎক্ষণাৎ তুলল হুংকার "মার মার"। তারা লাফ্‌টনকে টেনে সরিয়ে ছিল। তারপর ইট, পাটকেল ও কিল ঘুষি লাথি চড় পড়তে লাগল গান্ধীজীর উপর।

কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, এক শ্বেতাঙ্গমহিলা, তাঁর হস্তস্থিত ছত্রটি প্রসারিত করে গান্ধীজীকে রেখেছেন আড়াল করে। পরক্ষণেই দেখা গেল, এক শ্বেতাঙ্গের পরিচালনায় এক দল পুলিশ ছুটে এল।

তার ফলে গুনগন্ধী গান্ধীর প্রাণ আর প্রণষ্ট হল না। ঐ মহিলা ছিলেন ঐ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রী আলেকজাণ্ডারের সহধর্মিনী শ্রীমতী আলেকজাণ্ডার। তিনি দৈবাৎ তখন সেখানে এসে পড়েছিলেন।

ইংলণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন তখন ছিলেন ইংলণ্ডের সেক্রেটারী অব্‌ স্টেট। গান্ধীজীর উপর দৌরাত্ম্যকারি ঐ সব দুরাত্মাদের বিরুদ্ধে বিচারলয়ে অভিযোগ উত্থাপন করার জন্য তিনি ন্যাটাল সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ; লাফ্‌টন এবং এস্‌ কম্বেও সেইরূপ করার ন্যায়সংগত কথাই বলেছিলেন।

কিন্তু সত্য ছিল যাঁর জীবনের পথ্য সেই গান্ধীজী ক্ষমার পথ অবলম্বন করলেন। তিনি বললেন, 'অন্যায়কারীদের হৃদয় ভবিষ্যতে ন্যায়বোধ জাগ্রত হবে, তারা অনুতপ্ত হবে।'

॥ অমিত্রের মিত্র মোহনদাস ॥

গান্ধীজী অমিত্র শ্বেতাঙ্গ দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে মামলা করলেন না দেখে, ওরা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ল। গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হয়ে পড়ল।

ঐ সময়ে, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে একটা সংগ্রাম শুরু হল—ইংরাজদের সঙ্গে অরেঞ্জ ও ট্রান্সভাল রাজ্যের বুয়রদের যুদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজ অধিবাসীর মুখের হাসি শুকিয়ে গেল, তারা আতঙ্কে অধীর হল।

ঐ সময়ে শ্রীমান ধীমান মোহনদাস গান্ধী কি করলেন? —তিনি কি তাঁর প্রপীড়কদের প্রতি—অমিত্রদের প্রতি—বিদ্বেষবশবর্তী হয়ে রইলেন? না, রইলেন না। তিনি অমিত্রদের প্রতিও মিত্র আচরণ সম্পাদন করলেন। ভারতীয়দের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করলেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে, আহত ইংরাজদের সেবা করতে লাগলেন।

একজন ইয়োরোপীয় গান্ধীজীর ঐ সেবাকার্য সম্বন্ধে বলেন: "I saw the man and his small undisciplined corps on many a field of battle during the Natal Campaign. When succor was to be rendered, they were there".

গান্ধীজীর ঐ মহাপ্রাণতা দর্শনে, কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি, বিশেষ করে গান্ধীজীর প্রতি, শ্বেতাঙ্গদের বিদ্বেষ বিষ একটুখানি হ্রাস প্রাপ্ত হল।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং বোম্বাইয়ে ব্যারিষ্টারি করতে লাগলেন।

দেখা যাচ্ছে, যশ ক্রমে ক্রমে হয়ে পড়ছে মোহনদাসের বশ।

॥ মানব-বেঁধা দানব-বিধি ॥

কলিকালের কীর্তিমান শহর কলিকাতায়, দীনেশা ওয়াচা মহোদয়ের সভাপতিত্বে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। গান্ধীজী তাতে যোগদান করলেন। তারপরেই, এক তারবার্তা পেলেন ন্যাটালোর ভারতীয় ভাইদের নিকট থেকে : সত্বর এখানে আস্থন।

গান্ধীজী ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে আবার একাকী গমন করলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানকার ভারতীয়রা কি কি কারণে কি সব দুর্ভোগ ভোগ করছেন, তাই অবগত হওয়ার জন্য ইংলণ্ড হতে সেখানে আগত শ্রীচেম্বারলেনের সঙ্গে গান্ধীজী ভারতীয়দের পক্ষ হতে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন।

কিন্তু ট্রান্সভালের শ্বেতাঙ্গরা বললেন, গান্ধী তো এখানকার ভারতীয় নন। তাই এখানকার ভারতীয়দের পক্ষ হতে তিনি কোনরকম দাবি চেম্বারলেনের নিকট উপস্থাপিত করতে পারবেন না।

—শ্বেতাঙ্গদের এই দাবির ফলে, গান্ধীজী চেম্বারলেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সমর্থ হলেন না।

ওর পরে, গান্ধীজী ট্রান্সভালের জোহানেসবার্গ নামক স্থানে আইনজীবীর কর্ম আরম্ভ করলেন। ভারতীয়দের জন্য ভালো যা কিছু কাজ, তাই করার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে "ট্রান্সভাল বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" নাম দিয়ে একটি সমিতি স্থাপন করলেন।

গান্ধীজী ন্যাটালে একটি মুদ্রণালয় ক্রয় করলেন। ডার্বান হতে "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" (Indian Opinion) নাম দিয়ে একখানি বার্তাপত্র প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন। তার সম্পাদক হলেন

শ্রীএম্. এইচ. নজর। তামিল, হিন্দী, গুজরাটী এবং ইংরাজী ভাষায় সেই বার্তাপত্র প্রকাশ পেতে লাগল।

ঐ সময়ে, একদিন, তিনি রেলগাড়ীর যাত্রী হয়ে, ডার্বান যাওয়ার সময়, ইংরাজ লেখক রাস্কিনের রচিত "আণ্টু দি লাষ্ট" গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করতে লাগলেন।

ঐ গ্রন্থ পাঠ করতে করতে, গান্ধীজীর মনে হল, মানুষের মধ্যে প্রেম প্রতিষ্ঠার কার্য সম্পাদনের পক্ষে পল্লী অঞ্চলই অধিক উপযুক্ত বটে ; চঞ্চল নগর অঞ্চল সেই কার্যের পক্ষে প্রশস্ত ক্ষেত্র নয়।

ডার্বানের অনতিদূরে একটি গ্রাম। তার নাম "ফিনিক্স"। গান্ধীজী সেখানে "ফিনিক্স উপনিবেশ" নাম দিয়ে একটি আশ্রম স্থাপন করলেন। সেখানে কাল কাটাতে লাগলেন কতকটা প্রাচীন মুনিঋষির ন্যায়, শিক্ষাদান ও সেবা করার কার্যে নিযুক্ত হয়ে।

এল ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ। এল প্রচণ্ড প্লেগ রোগ, আক্রমণ করল জোহানেসবার্গের ভারতীয় ভাইদের। কিন্তু মোহনদাস সর্বদাই মানুষের সেবক ও সুহৃদ। তাই তিনি তখন হলেন প্লেগরোগীদেব স্বেচ্ছাসেবক। তাঁর সঙ্গে রইলেন আরও কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক। কৃষ্ণাঙ্গদের সেই সেবা এমন কি শ্বেতাঙ্গদেরও হল মনোলোভা।

এর কিছু কাল পরে, কৃষ্ণকায়দের উপর আবার এল ট্রান্সভালের শ্বেতাঙ্গ সরকারের ভ্রাতৃভাব বর্জিত ভূতুড়ে ভাব। তাঁরা প্রবর্তন করলেন "এশিয়াটিক রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট"।

যে সব ভারতীয় তখন ট্রান্সভালে রয়েছেন, তাঁদের সকলেরই সরকারী খাতায় নাম রেজিষ্ট্রি করতে হবে, চোরের মতো আঙুলের টিপসই দিতে হবে, এই হ'ল সেই অবৈধ বিধি বা আইন।

—ভারতীয়দের ভাল অপমানের মালিন্যযুক্ত করাই হল সেই আইনের বিদ্বেষবিষদিগ্ধ উদ্দেশ্য।

জন সেবক গান্ধীজী তখন ঐ অবৈধ বিধি শান্তিপূর্ণভাবে অমান্য

করার জন্য ভারতীয় ভাইদের উৎসাহ ও পরামর্শ দিলেন। ঐ আইন যাতে রহিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেও বিস্তর চেষ্টা করলেন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গের শয়তানি বন্ধ হল না।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সেই শয়তানী আইন বলবৎ হয়ে গেল।

তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে আরম্ভ হল সেই আইন অমান্য আন্দোলন।

শ্বেতাঙ্গ শাসকেরা তখন গান্ধীজী সহ বহু ভারতীয়কে বন্দীশালায় বন্দী করল। বিদেশে অবস্থিত অবস্থায় ভারতীয়দের সেই সৎ সাহস প্রদর্শনের ঘটনা সংঘটিত হল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের অন্তিম অংশে।

শ্বেতাঙ্গ সরকারের পক্ষ হতে জেনারেল স্মাট্‌স্ তখন গান্ধীজীকে বললেন, আপনারা আন্দোলন বন্ধ করুন ; অন্ততঃ এইবার আপনাদের নাম রেজিষ্ট্রি করিয়ে নিন ;—তা হ'লে, ওর পরেই এই আইন রহিত করে দেওয়া হবে।

গান্ধীজী সেই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করলেন। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। অনেক ভারতীয় তাঁদের নাম রেজিষ্ট্রি করালেন। কিন্তু তারপরে দেখা গেল, জেনারেল স্মাট্‌সের প্রতিশ্রুতি হয়ে গেল পঙ্কবৎ—কার্যে পরিণত হল না।

তখন পুনর্বার আরম্ভ হল ভারতীয়দের মান রক্ষার জন্য আইন অমান্য। গান্ধীজী ঐ ব্যাপারে দুইবার কারাবন্দী হলেন। তখন ভারতে আন্দোলন আরম্ভ হল গান্ধীজীর শ্বেতাঙ্গ সহকর্মী শ্রীপোলক-এর নেতৃত্বে। ইংলণ্ডে আন্দোলন চলল গুণধি গান্ধীর নেতৃত্বে।

ভারতের গৌরবান্বিত নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখেল এবং শ্রীপোলক ভারতে প্রবল আন্দোলন চালালেন। তার ফলে তখনকার পরাধীন ভারতের ইংরাজ সরকার চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক ভাইদের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরণ করতে অসম্মত হতে সম্মত করতে সমর্থ হলেন।

এইবার দক্ষিণ আফ্রিকার অসুর ভাবাপন্ন সরকার—ভারতীয়দের প্রতি শত্রুতার শরবর্ষী সরকার—বেশ অসুবিধা বোধ করলেন। কিন্তু তবু ন্যায়বোধ তাঁদের মধ্যে জাগ্রত হল না। তাঁরা নিয়ম করলেন—ভারতীয় শ্রমিককে প্রতি বছর মাথা পিছু কর দিতে হবে তিন পাউণ্ড করে। কিন্তু কোন ভারতীয়ই সেই অন্যায়ের নিকট নতি স্বীকার করলেন না।

ট্রান্সভালের একটা অঞ্চলে প্রবেশ করা ভারতীয়দের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। গান্ধীজী সেই অঞ্চলেই প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করলেন প্রায় দুই সহস্র ভারতীয় ভগ্নী ও ভ্রাতা। তাঁদের সেই ন্যায়সংগত কর্মের ফলে, গান্ধীজী সহ অনেককেই আবার প্রবেশ করতে হল কারাগারে।

শ্বেতাঙ্গ-সরকারের ঐরূপ ঘোর অত্যাচার দর্শনে, ইক্ষুক্ষেত্রের শ্রমিক ভাইয়েরা করলেন ধর্মঘট। তারপরেই তাঁদের উপর শ্বেতাঙ্গ শয়তানেরা বর্ষণ করল গুলী। আমাদের কত ভারতীয় ভাইয়ের উড়ে গেল মাথার খুলি ; রক্তাক্ত হয়ে গেল ধরণীর ধূলি।

লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন ভারতের বড় লাট। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের ঐ অসুর আচরণ সম্বন্ধে তথ্য অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে এক কমিশন গঠিত হল। তার নাম "সলোমন কমিশন"।

অতঃপর উক্ত কমিশনের প্রকাশিত অভিমতে দেখা গেল, ভারতীয়দের প্রতি করা হয়েছে যেরূপ আচরণ, সেটা ভারতীয় ভাইদের বক্ষে সবেগে বৈরীর চরণ অর্পণ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। এর পরে, ন্যায়হীন দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যায় আইনের প্রায় সবগুলোই বাতিল হয়ে গেল। —গুণধি গান্ধীর গৌরব বৃদ্ধি পেল।

ভারতের ভালো ছেলে ভারতমোহন মোহনদাস এইবার ভারতে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করলেন। ঐ সময়ে তিনি শ্রবণ করলেন, দ্বাপর যুগের গোপালের দেশ ভারতের আধুনিক কালের গোপাল—গোপালকৃষ্ণ গোখেল বিলাতে ব্যাধিবিদ্ধ অবস্থায় শয়ান রয়েছেন শয্যায়।

গান্ধীজী তখনই গোপালকৃষ্ণ দর্শনের জন্য ইংলণ্ডে চলে গেলেন।

যথাসময়ে গোপালকৃষ্ণ ব্যাধিবিমুক্ত হলেন। গান্ধী তখন পুনর্বার ভারতযাত্রার উদ্যোগ করলেন।

ঐ সময়ে সহসা আরম্ভ হয়ে গেল ইংরাজ-জার্মান সংগ্রাম।

মহাপ্রাণ মোহনদাস তখন পুনর্বার ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করলেন। ইংরাজ সরকার তাঁদের সাহায্য লাভ করলেন। অতঃপর, সেই সরকার, গান্ধীজীর মহত্ত্বের প্রশংসা করে, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন তাঁকে "কাইজার-ই-হিন্দ" বলে অভিহিত স্বর্ণপদক প্রদান করে।

গুণধি গান্ধী এইবার ভারত অভিমুখে যাত্রা করলেন।

॥ দিকে-দিকে নব দীপ-দীধিতি ॥

ভারতীয় ভাই-ভগিনীরা উন্মুখ মন নিয়ে তাঁদের গান্ধী ভাইয়ের আগমন পথের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন।

গান্ধী ভারতের পশ্চিম দ্বার বোম্বাই নগরে উপনীত হলেন। সুগৌরবী গোপালকৃষ্ণ গোখেলকে বলা হয় গান্ধীজীর রাজনীতিক গুরু।

গোখেল তখন বোম্বাইয়ে গান্ধী সংবর্ধনা সভার অনুষ্ঠান করলেন। পরবর্তীকালে ভারতের দেহাংশ কর্তন করে পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠাতা ভারত সন্তান মহম্মদ আলি জিন্না প্রভৃতি বহু মুসলমানও সেই সভায় সমাসীন হয়েছিলেন।

ব্যারিষ্টারি ক্ষেত্রে অনেকে যাঁকে মনে করত বোবাবৎ, সেই গান্ধী হয়ে উঠতে লাগলেন বরণীয়, হয়ে উঠতে লাগলেন বরিষ্ঠ।

গান্ধীজী গুর্জরের অন্তর্গত আমেদাবাদ নগরে একটি আশ্রম স্থাপন করলেন। তার নাম 'সত্যাগ্রহ আশ্রম'। নিগ্রহের নিরোধে সত্যাগ্রহ যে কত শক্তিশালী গান্ধীজী তাঁর অপ্রতিম প্রজ্ঞাবলে সেটি প্রকৃষ্টরূপেই উপলব্ধি করেছিলেন। সেই আশ্রমের কর্মী হলেন নারী ও পুরুষ। স্বদেশীভাবব্রত অবলম্বন, ভীতিত্যাগ, বাক্-সংযম, সত্যপালন এবং কঠোর পরিশ্রম প্রভৃতি হল সেই কর্মীদের কর্তব্যের অন্তর্গত।

গান্ধীজী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের নানা অঞ্চলে পর্যটন করলেন, ভারতের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার চেষ্টা করলেন।

ঐ সময়ে পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার জন্য বঙ্গদেশে এবং ভারতের আরও কোন কোন অংশে নির্ভীক মানুষ অস্ত্রবলে ধড়িবাজ-ইংরাজ শাসককে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন। বক্তৃতাবলে বা স্বর-বলে স্বদেশোদ্ধার সাধনা দুর্বল বলে গণ্য হয়ে, শর-বলে স্বদেশোদ্ধারের সাধনা সবল সাধনা ব'লে গণ্য হয়েছিল।

সেই যুগে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে মোহনদাস গান্ধী কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে ষ্টুডেণ্ট্‌স্ হলে একটি সভায় ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে তিনি অহিংসারই প্রশংসা করেন।

তারপরে এপ্রিল মাসে মাদ্রাজে এক ভোজ-সভায় তাঁর ভাষণ—সেও এক নব দর্শন। অত্যাচারী শাসককে হত্যা না ক'রে, তার মনের বিদ্বেষ ভাবটাকে হত্যা করাই শ্রেয়ঃ, গান্ধীজী এইরূপ বললেন।

মাদ্রাজে ইয়ংম্যান্স্ ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েসনে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হল। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী হলেন তার সভাপতি। সেই সভায় গান্ধীজী বললেন, কোন বিদেশী জাতি যদি বিদেশী কৃষ্টি আমাদের সম্মুখে আনয়ন করে, আমরা স্বীয় শক্তি-বলে সেই কৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করতে পারি।

গান্ধীজী হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধন প্রয়োজন বলে বোধ করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ ভারতের মায়াবরম্ নামক নগরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জনসভায় একটি ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন হিন্দু সমাজে যাঁদের বলা হয় অস্পৃশ্য, ঐরূপে তাঁদের তুচ্ছ না করে, তাঁদের উচ্চ ক'রে তোলাই হচ্ছে হিন্দু সমাজের একটি মহৎ কর্ম। তাতে সমগ্র হিন্দু সমাজেরই হিত।

স্বদেশী সাজ-পোষাক, এবং স্বদেশী শিল্প ইত্যাদি প্রিয় হয়ে উঠে জাতির শ্রেয়ঃ সাধন করে। মহান মোহন সেই কথা বললেন তাঁর অন্য এক বক্তৃতায়। তিনি বললেন, আমরা যদি ইচ্ছা করি, তা হলে অবশ্যই নিজেকে স্বদেশী সজ্জায় সজ্জিত করতে পারি। তাই করার জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয় প্রয়োজন হবে না।

স্বাধীনতা আয়ত্ত করার নব পন্থা, সমাজ সংস্কার, শিল্প-কল্পনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে দিকে দিকে সেই যুগে মহান মোহন যেন নব নব দীপ প্রজ্বলিত করতে লাগলেন।

॥ মোহনের চম্পারণ-রণ ॥

ভারতে সেই যুগে বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের কর্তৃত্বে নীলের চাষ ভারতের শ্রমিকদের করছিল সর্বনাশ—শরীর নাশ, জীবন নাশ, অর্থনাশ, সম্মান নাশ। সেই শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয় কর্মীদের প্রতি কত যে কুকর্ম করত, তার সংখ্যা নিরূপণ করতে গেলেও শঙ্কা বোধ হবে।

সেই শ্বেতাঙ্গদের বলা হয় নীলকর।

বিহারের চম্পারণে সেই নীলকরদের নির্যাতন যেন দুর্নির্ণেয় হয়ে পড়েছিল।

মোহনদাস করমচাঁদ, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল বিহারের মজঃফরপুরে উপনীত হয়ে, যানযোগে যাত্রা করলেন মতিহারি অভিমুখে।

নীলাঞ্চলে উপস্থিত হলেন মোহনদাস করমচাঁদ। নীল শ্রমিকদের অন্ধকার জীবন-গগনে যেন উদিত হল চাঁদ।

পরবর্তী দিন তিনি চম্পারণের জেলাশাসকের এক আদেশ প্রাপ্ত হলেন। এই দেশের সেবকের প্রতি বিদ্বেষী বিদেশীর সেই আদেশ এইরূপ: 'গান্ধী চম্পারণ হতে প্রস্থান করুন। কারণ তাঁর উপস্থিতির ফলে ও বলে শান্তিভঙ্গ হতে পারে।'

প্রকৃতপক্ষে, নীলকরদের কঠোর নিপীড়নে, শান্তি কিন্তু সে অঞ্চলে মোটেই ছিল না। শান্তি ছিল না, কান্তি ছিল না; ছিল ক্লান্তি, অশান্তি।

মোহনদাসের হৃদ্দেশ বিদেশী শাসকের সেই বিদ্বেষ-আদেশ উপেক্ষা করল। তিনি শোষক জেলাশাসককে জানালেন: 'চম্পারণে আমি করব বিচরণ।'

বিদ্বেষী বিদেশী-শাসক দেখল, গান্ধীর শাস্তির ভয় নাস্তি। ভারতের স্বস্তির জন্য ভারত সন্তান স্বীয় অস্থিদানে প্রস্তুত।—ভারতের হস্তী শ্বেতদ্বীপের শৃগালকে ভয় করে না।

গান্ধীজী ১৮ই এপ্রিল বিদেশী-শাসকের বিচারালয়ে বা অবিচারালয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, 'তিনি চম্পারণ হতে চ'লে যাওয়ার আদেশ অমান্য করেছেন।'

বিচারকের রায়দান সেদিন আর হল না। তার পরেও আর কোন দিনই হল না। কারণ জেলা-শাসকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিরোধের মীমাংসার পথ অবলম্বন করতে চাইলেন। নীল শ্রমিকদের অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য এক কমিটি গঠিত করা হ'ল। গান্ধীজীকে করা হল সেই কমিটির অন্যতম সদস্য।

পরে উক্ত কমিটির প্রকাশিত অভিমতে প্রকাশ পেল যে, নীল-করেরাই দোষী, নীল শ্রমিকেরা অত্যাচারই লাভ করেছেন—সুবিচার প্রাপ্য হন নি। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নীলচাষ সম্বন্ধীয় অন্যায় আইনের পরিবর্তন সাধন করা হল।

সেই চম্পারণ-রণে মোহনদাস গান্ধী হলেন বিজয়ী।

॥ নিগ্রহনিরোধে সত্যাগ্রহ ॥

ভারতের জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের একটি অধিবেশন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হল। গান্ধীজী তাতে যোগদান করলেন। সে হচ্ছে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা।

গান্ধীজীর নেতৃত্বে আবার এক বিজয়-অবদান।

গুজরাটের খয়রা জেলায় অজন্মা হল। তার ফলে হল দুর্ভিক্ষ। কিন্তু বিদ্বেষী বিদেশী শাসক তথাপি দরিদ্র জনগনের নিকট হতে জোর ক'রে খাজনা আদায় করতে লাগল। খাজনা আদায়ের জন্য গরীব লোকের উপর কোনরকম পীড়ন করতেই তারা পরাঙ্মুখ হল না। তাদের দুষ্টবুদ্ধি খাজনার পরিমাণও বৃদ্ধি করে দিল। হয় খাজনা দাও, না হয় যমের বাড়ী যাও—এই হল বিদেশী শাসকের কুশাসনের ও শোষণের নীতি।

গান্ধীজী বিদেশী ইংরাজ শাসকের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন: 'দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দরিদ্র জনগণকে নিষ্পিষ্ট না ক'রে তাদের দেয় এক-বৎসরের খাজনা আদায় করা বন্ধ রাখা হোক।' কিন্তু ভারত বিদ্বেষী বিদেশী সেই ন্যায়পথ অবলম্বন করল না। তারা অন্নাভাবগ্রস্ত প্রজাদের নিকট প্রাপ্য খাজনার পরিবর্তে প্রজাদের সব কিছু সম্পদ দখল ক'রে নিতে লাগল। নীলামে বিক্রয় করে দিতে লাগল ধনী লোকদের নিকট।

গান্ধীজী তখন কি করলেন? তিনি কুশাসনের নিগ্রহনিরোধে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করলেন। তাঁর নেতৃত্বে জনগণ ঘোষণা করলেন: কুশাসন মানব না, শোষণ মানব না—খাজনা দেব না।

বিদ্বেষী ইংরাজ-শাসক তখন হল নরনাশক—তারা খয়রার

ক্ষুধাক্লিষ্ট ভারতীয় জনগণের প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচারই করতে-বাকি রাখল না।

কিন্তু দরিদ্র জনগণ, চরমতম দুঃখ ভোগ করা সত্ত্বেও, অসৎ শাসকের নিকট নতি স্বীকার করলেন না।

অবশেষে, অসৎ শাসকই হার মানল সর্বহারা দরিদ্রদের সম্মুখে।

বিদ্বেষী বিদেশী ইংরাজ সরকার খয়রার জনগণের নিকট হতে খাজনা আর আদায় করল না এবং বলপূর্বক দখলকরা সমুদয় সম্পদও জনগণকে প্রত্যর্পণ করা হল।

নিগ্রহ-নিরোধ সত্যাগ্রহ সাফল্য মণ্ডিত হল।

॥ শ্রমিকদের জন্য শ্রম ॥

আমেদাবাদে রয়েছে বহু কলকারখানা। কলকারখানার শ্রমিকেরা সামান্য কিছু পারিশ্রমিক বৃদ্ধি চাইলেন ; চাইলেন আরও কিছু সামান্য সুবিধে। কিন্তু কলকারখানার কর্তারা সে সব প্রদান করতে পরাঙ্মুখ হলেন।

যাতে উভয় পক্ষের মধ্যে আপসে মীমাংসা হয়ে যায়, গান্ধীজী সেই চেষ্টা করলেন। কিন্তু দ্বেষ্টা মিল মালিকেরা সেই ন্যায়সংগত সামান্য স্বার্থও শ্রমিকদের প্রদান করতে চাইলেন না।

গান্ধীজী তখন শ্রমিকদের বললেন, আপনারা কার্য করা বন্ধ করুন —ধর্মঘট করুন।

দরিদ্র শ্রমিকেরা ধর্মঘট করলেন। একুশ দিবস যাবৎ চলল সেই মহৎ ধর্মঘট। মিলমালিকেরা তখন শ্রমিকদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন। শ্রমিকেরা নানারকমেই ক্লেশ ভোগ করতে লাগলেন।

গান্ধীজী তখন আর্ত শ্রমিক ভাইদের স্বার্থরক্ষার জন্য অনশন অবলম্বন করলেন।

গান্ধীজীর সেই উপবাসের ফলে, শ্রমিকদলে যেন বিজলী উঠল জ্বলে—শ্রমিকেরা ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার বল লাভ করলেন।

এইবার মিল মালিকরা আর্ত দরিদ্র শ্রমিকদের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। তাঁরা মীমাংসার পথ ধরলেন।

নিগ্রহনিরোধে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ সাফল্য লাভ করল।

॥ ভারতের নির্ভীকতা ॥

বিগত ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বব্যাপী এক সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। তাকে বলা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ইংরাজ তখন বিপন্ন। তাই সে তার অধীন ভারতের হল শরণাপন্ন। ইংরাজ পক্ষের সৈনিক হওয়ার জন্য ভারতীয় জনগণের প্রতি এল আহ্বান।

গান্ধীজী তখন ভারতীয় ভাইদের আহ্বান করে বললেন, "It therefore, behoves us to learn the use of arms and to acquire the ability to defend ourselves". —আমাদের কর্তব্য অস্ত্রব্যবহার শিক্ষা করা এবং নিজেদেরে রক্ষা করার সামর্থ্য অর্জন করা।

ভারত তখন ভাবল, এই যুদ্ধে যদি ইংরাজকে সাহায্য করা হয়, তাহলে, যুদ্ধশেষে ইংরাজ ভারতের হস্তের অধীনতা-পাশ শিথিল করবে নিশ্চয়।

ইংলণ্ডের তখনকার প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জও ভারতকে ঐরূপ কিছু ভরসাই দিলেন।

তারপর সেই বিশ্ব-সমর শেষ হয়ে গেল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ভারতের ইংরাজ অধীনতার এক কণাও শেষ হল না।

কয়েক লক্ষ ভারতীয় সেই সময়ে ইংরাজের শত্রুর করে জীবন দিয়ে ইংরাজ-রাজ্যের জীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। তার বিনিময়ে ভারত ইংরাজের নিকট থেকে কি লাভ করল? লাভ করল 'রাউলাট আইন।'

সেই আইনের উদ্দেশ্য হল—ভারতের যে কোন মানুষকে, তাঁর বিচার না করেই, বন্দীশালায় বন্দী ক'রে রাখা—ভারতের পরাধীনতা পূর্বাপেক্ষাও পাকা করে ফেলা।

ইংরাজ "রাউলাট-আইন" জারি করল।

গান্ধীজী তখন ভারতের ভাই-ভগ্নীদের পরামর্শ দিলেন, 'ঐ অন্যায় আইনের প্রতিবাদে সমগ্র দেশে হরতাল পালন করা হোক।'

সমগ্র ভারত ৬ই এপ্রিল হরতাল পালন করল। তাই দেখে, ইংরাজের একটু টনক নড়ল।

কিন্তু কেবল হরতাল নয়, আইন অমান্য আন্দোলনও আরম্ভ হল। আইনের ভয় জয় ক'রে প্রকাশিত হল "সত্যাগ্রহী" নামক একখানি পত্রিকা।

ভারতের ইংরাজ সরকার সত্যাগ্রহী গান্ধীজীর প্রতি বিদ্বেষবিষ প্রসূত আদেশ জারি করেছিল— তিনি পাঞ্জাবে প্রবেশ করবেন না, দিল্লীতে প্রবেশ করবেন না।

কিন্তু অন্যায় আইন মানবার মানুষ গান্ধীজী নন। তিনি বোম্বাই থেকে দিল্লী যাত্রা করলেন।

তখন গান্ধীজীকে দোষী সাব্যস্ত করে, কোশী নামক স্থানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। বোম্বাইয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল।

গান্ধী বন্দী হওয়ায়, ভারতের জনগণ মনে করলেন, তাঁরা সকলেই বন্দী হলেন।

আমেদাবাদে তখন জনগণ পৌরুষ প্রকাশে প্রমত্ত হলেন। সেখানে অনেক কিছু ধ্বংস হতে লাগল। নাশক ইংরাজশাসক তখন সামরিক আইন জারি করল। নির্দোষ, নিরীহ মানুষের উপর গুলীবর্ষণ করল। তার ফলে ভারত ভীত হল না। দিল্লীতে, পাঞ্জাবে এবং নানাস্থানে বিক্ষোভ উগ্র হয়ে উঠল।

ইংরাজ সরকার পাঞ্জাবের লোকনায়ক শ্রীসত্য পালকে নির্বাসিত করল অমৃতসর থেকে। শহরের সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে লাগল ইংরাজের সৈনিক।

বহুলোক তখন চললেন ইংরেজ পুলিশকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করবার জন্য, প্রতিকার প্রাপ্তির জন্য। পথে বন্য ইংরাজ সৈন্য তাঁদের উপর চালাল গুলী। উড়ে গেল ভারতের মানুষের মাথার খুলি, রক্তসিক্ত হল পথের ধূলি।

কিন্তু ধড়িবাজ ইংরাজ শাসক জনার্দনের এই দেশের মানুষের মনকে মর্দন করতে পারল না। এই দেশের মানব ইংরাজের বিদ্বেষ-দানবকে বাধা দিলেন। ইংরাজ শাসকের অনেক অফিসে চলল লুণ্ঠন, ছিঁড়ে ফেলা হল টেলিগ্রাফের তার, কয়েকজন ইংরাজ নর-নারী পেল প্রহার।

বিশ্বযুদ্ধকালে যে ভারত হল ইংরাজের বন্ধু, সেই ভারতের মানুষের বুকে নিক্ষিপ্ত হল ইংরাজের হাতের বন্দুকের গুলী।

ভারত দেখল ইংরাজ কত বড় ধড়িবাজ !

॥ জালিয়ানওয়ালাবাগের জ্বালা হল ভারতের মালা ॥

পাঞ্জাবে আরম্ভ হল ইংরাজের প্রেত-নৃত্য। এক ইংরাজ সেনানায়কের নাম ছিল ডায়ার। তার উপর দেওয়া হল পাঞ্জাবের পৌরুষ প্রকাশের ভার।

ভারতের বহু সেবককে বন্দীশালায় নিক্ষেপ করে, তাঁদের উপর করা হতে লাগল নানারূপ পীড়ন। সরকারী অনুমতি ব্যতীত সভাসমিতি অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ, কেবলমাত্র চারিটি মানুষের একসঙ্গে মিলিত হওয়াও নিষিদ্ধ—এই বিদ্বেষ আদেশও জারি করা হল।

কিন্তু ভাস্বর ভারত কি তাতে ভয় পায়, ভয় খায় !

ইংরাজের শাসনজাল ছিন্ন করার উপযুক্ত উপায় সন্ধানের উদ্দেশ্যে ভারতীয়গণ জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক একটি স্থানে মিলিত হলেন

১৩ এপ্রিল। বেলা তখন ৪ঘটিকা। তখন তাঁরা এসেছেন সেখানে একটি সভা করতে। একমাত্র মনোবল ব্যতীত অন্যকোনরূপ অস্ত্রবল তখন তাঁদের নেই।

ইংরাজ সেনানায়ক ডায়ার তখন সন্নিকটেই ওত পেতে রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে তার সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ দল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ভীতিহীন ভারতীয়দের সভা আরম্ভ হল।

আর ঠিক সেই মূহূর্তেই তাঁদের উপর আরম্ভ হল ইংরাজের গুলীবর্ষণ। একবার নয়, দুইবার নয়, অনেকবার। তারপর ষোল শ' রাউণ্ড গুলী বর্ষণ করা হল। ওদের সঙ্গের গোলা-গুলী বর্ষিত হতে হতে, সেগুলো ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্তই চলল সেই গুলীবর্ষণ—সেই নিরস্ত্র নর-নারী শিশুদের উপর।

সেই জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রবেশের বা সেখান থেকে বহির্গত হওয়ার পথ ছিল একটি মাত্র।

সেই ঘটনার কারণ ও ফলাফল সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে ইংরাজের গঠিত 'হাণ্টার কমিটি'র সম্মুখে ডায়ার নিজেই ব'লেছিল, 'গুলীবর্ষণ না করেও সেই জনগণকে সেখান থেকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়তো সম্ভব ছিল।'

ইংরাজ সরকারের প্রদত্ত অসত্য বিবরণেই প্রকাশ, জালিয়ান-ওয়ালাবাগে সেদিন ভারত সন্তান নিহত হন চারিশতাধিক, আহত সহস্রাধিক।

ধিক্, ধিক্, ধিক্! ইংরাজকে ধিক্!—এই কথাই সেদিন উচ্চারণ করেছিল চতুর্দিক।

জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রাপ্ত সেই জ্বালা হয়েছে স্বাধীন ভারতের গলার মালা। দুঃখের স্রোতে দুঃখের পোতে সুখ চলে আসে সুদূর হতে।

॥ ভারতের অসহযোগ ঃ বৃটিশের দুর্যোগ ॥

(অসহযোগ আন্দোলন)

ভারতের পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে জালিয়াৎ ক্লাইভের জ্ঞাতিদের নিষ্ঠুরতম হিংসাকার্য অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতভক্ত গান্ধী জালিয়ানওয়ালাবাগ দর্শন করলেন।

সেই যুগে তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলমানগনের ধর্মমণ্ডকের নেতা বা 'খলিফা'। ঐ সময়ে ইংরাজ সেই খলিফার বিরুদ্ধে খলতা অবলম্বন করল। তার ফলে, খলিফা সেই সুলতান তাঁর কতৃত্বচ্যুত হলেন। মুসলমানগণ তখন খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁরা "খিলাফৎ" আন্দোলন আরম্ভ করলেন।

গান্ধীজী তখন বললেন, "ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বৃটিশ-শাসন-বিরোধী আন্দেলনে এবং 'খিলাফৎ আন্দোলনে' সকলেই যোগদান করতে পারেন। বিদেশী বস্ত্র বর্জন করা হোক, ভারতে ইংরাজ শাসনের সঙ্গে অসহযোগিতা করা হোক।"

গান্ধীজীর সেই হিতবাদ ভারতকে ভাস্বর হয়ে উঠবার জন্য করে তুললেন যেন উন্মাদ।

কলিকাতায় ভারতের জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। জাতির প্রতি সেই মহাসভায় মহানির্দেশ হল এইরূপ ঃ

(১) ভারতীয়গণকে ইংরাজ সরকার যে সব উপাধি দান করেছে ভারতের পক্ষে সেই উপাধি হচ্ছে ব্যাধির মত। সেই উপাধি ত্যাগ করতে হবে। মিউনিসিপালিটি ও জেলাবোর্ডের ইংরাজ সরকারের সদস্যরা পদত্যাগ করবেন। (২) ইংরাজ সরকারের বিদ্যালয় বর্জন করতে হবে; ভারতের জাতীয় বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জন করতে হবে।

(৩) ইংরাজের বিচারালয় ও অফিসের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক রাখা হবে না। (৪) বিলাতী বস্ত্র ও বিলাতী শিল্পদ্রব্য বর্জন কর, ভারতীয়দের হাতে কাটা সূতায় প্রস্তুত করা খদ্দর নামক বস্ত্র সকলকে ব্যবহার করতে হবে ও ভারতে নানারূপ শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করতে হবে। (৫) ইংরাজ সরকারের আইনসভা ও শাসন পরিষদ ইত্যাদির সদস্যপদ লাভের চেষ্টা কেউ করবে না ; ঐ বিষয়ে কেউ ভোটও দেবে না। (৬) ইংরাজ সরকারের কতৃত্বে অনুষ্ঠিত ভোজ-সভা ইত্যাদিতে কোন ভারতীয়ই যোগদান করবেন না।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ঐরূপ প্রস্তাব বিঘোষিত হল। সমগ্র ভারত ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে উদগ্র হল। ভারতীয় মানুষ ইংরাজ সরকারের নানারকম সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কে ত্যাগ করতে লাগলেন। সরকার ছোট-বড় নানা বিদ্যালয় হতে লাগল প্রায় ছাত্রশূন্য, প্রায় শিক্ষকশূন্য। ইংরাজের বিচারালয়ে বিচারার্থীদের বিচরণ খুবই হ্রাস পেল।

চলল ইংরাজ শাসনের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন।

বিলাতী কোট-প্যাণ্ট ভারতীয়গণের নিকট তখন লাভ করল অনাদর। বিলাতী বস্ত্র বর্জিত হল ; সমাদৃত হল ভারতের খদ্দর।

বিজাতীয় নেকৃটাই বা গলাবন্ধ ভারতের দেহে গণ্য হল একটা দুর্গন্ধ। নেকৃটাই দূরে নিক্ষিপ্ত হল।

বিলাতী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং। মদ অতি বদ। সেই বদ মদের দোকানে পিকেটিং চলল। ইংরাজের প্রদত্ত খেতাবকে খতম করে দেওয়া হতে লাগল।—বর্জিত হতে লাগল। ভারতীয় ছাত্রী ও ছাত্র ইংরাজ বিদ্যালয় ত্যাগ করতে লাগল। ভারতীয় বহু আইনজীবী ইংরাজের বিচারালয় বিছার মতই এড়িয়ে চলতে লাগলেন। বঙ্গের চিত্তরঞ্জন দাস এবং উত্তর ভারতের পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি ইংরাজের বিচারালয় বর্জন করলেন।

ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁদের ডিউক অব্ কনট ভারতের সঙ্গে মিটমাট করার একটা অভিনয় করার জন্য ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী ভারতে এলেন। ইংরাজের পীড়নপিষ্ট ভারত তাঁকে অভ্যর্থনা করল না। ভারত তখন হরতাল পালন করল। দোকানপাট, বাজার বন্ধ রইল।

ভারতের ইংরাজ বড়লাট লর্ড রিডিংয়ের সঙ্গেও গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হল। কিন্তু ফাঁকিবাজ ইংরাজ সরকার সাধু মনোভাব অবলম্বন করে ভারতের সঙ্গে মিটমাট করল না।

ভারতের ন্যায়সংগত স্বার্থ আদায় করার জন্য অসহযোগ আন্দোলন যেমন চলছিল, তেমনই চলতে লাগল—ভারতের ইংরাজের মসনদ টলতে লাগল।

এর পরে, ইংলণ্ডের যুবরাজ এলেন ভারতে, ভারতের ন্যায়সংগত অধিকার এড়িয়ে, তথাকথিত মিটমাট করতে। তখনও ভারত পালন করল হরতাল। তাই দেখে, কুঞ্চিত হল সেই ক্রুদ্ধ যুবরাজের ভাল।

যারা ভারতের জনগণকে বার বার অবহেলা করেছে, অবজ্ঞা করেছে, পীড়ন করেছে, সেই ইংরাজের পোষাক, নর-নারী, ট্রামগাড়ী ইত্যাদি এইবারে ভারতের জনগণের হাতে কিছুটা প্রতিশোধ প্রাপ্ত হল। তখন ভারতের জনগণের উপর গুলী চালাল বন্য ইংরাজ সৈন্য বা গোরা সৈন্য।

শান্তিপন্থী গান্ধী তখন ভারতের জনগণকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ করলেন আমরণ অনশন। তখন ভারতের সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ প্রীতি-সূত্রে অবস্থানের ইচ্ছা ঘোষণা করলেন। গান্ধীজী তখন আমরণ অনশন ত্যাগ করলেন।

ভারতমোহন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের চেষ্টার ফলে ভারতের নেতৃবর্গ এবং লর্ড রিডিংয়ের মধ্যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু

ঠক ইংরাজ সরকার ভারতের সুসংগত অধিকার দানের অনুরোধকে অগ্রাহ্য করল।

আবার চলল শান্তিবাদী ভারতের উপর ইংরাজ সরকারের আসুরিক অত্যাচার। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এবং অন্যান্য ভারত নেতৃবর্গ কারাগারে বন্দী হলেন। পীড়নপটু ইংরাজের পুলিশ অকাতরে অত্যাচার চালাল নিরস্ত্র ভারতীয়দের উপর।

এইবার ভারতের জাতীয় মহাসমিতির বা কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল আমেদাবাদে। সেই মহাসমিতি গান্ধীজীকে করে দিল ভারতের আন্দোলনের মহানায়ক—সর্বময় কর্তা।

অসহযোগ, অনশন, অহিংসা ইত্যাদির দ্বারা গান্ধীজী ভারতের সেবা সম্পাদন করতে লাগলেন।

॥ রণক্ষেত্র বার্দৌলি
চৌরিচৌরায় স্বাধীনতা সংগ্রামাগ্নি ॥

স্বাধীনতার স্বর্ণমঞ্চের অভিমুখে ভারত ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হতে লাগল।

গান্ধীজী ইংরাজের শাসন-শোষণের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে গুজরাটের বার্দৌলি নামক স্থানে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন সর্বপ্রথম আরম্ভ করবেন বলে স্থির করলেন।

তার পূর্বে লর্ড রিডিংকে এক পত্রযোগে গান্ধী জানালেন: 'ন্যায়সংগত অসহযোগ আন্দোলনকালে যাঁদের বন্দী করা হয়েছে, তাঁদের মুক্তি চাই; সংবাদপত্রের স্বাধীনভাবে সংগত কথা প্রকাশ করার অধিকার চাই; ভারতীয়গণের জরিমানার টাকা এবং বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফেরত পাওয়া চাই;—এই সব পূর্বেই দাবি করা হচ্ছে। এইসব দাবি যদি সপ্তদিবসের মধ্যে পূর্ণ হয়, তা হলে, অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন চালানো হবে না।'

গান্ধীজীর সেই চরমপত্র প্রকৃতপক্ষে গরম পত্র ছিল না, ছিল নরম পত্র।

কিন্তু সেই পত্রের উত্তর এল লর্ড রিডিংয়ের কাছ থেকে উপেক্ষা, এবং ভারতের উপর অত্যাচার চালানোর শাসানি নিয়ে।

ঐ সময়ে একদিন চৌরিচৌরা নামক স্থানে স্বাধীনতাকামী ভারত সন্তানদের শক্তি আত্মপ্রকাশ করল—থানায় অগ্নি সংযোগ, এবং ইংরাজের কতিপয় পুলিশকে অগ্নিতে আহুতি দান ইত্যাদি ঘটনা ঘটে গেল।

শান্তিপন্থী গান্ধীজী তখন আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখলেন। পঞ্চদিবস কাল অনশনও করলেন।

সবরমতী আশ্রমে গমন করলেন তিনি। খদ্দর, কুটির শিল্প, পল্লী-সংস্কার ইত্যাদি কর্মে দেশসেবা করতে লাগলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং পণ্ডিত মতিলাল হলেন তখন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রের নায়ক।

গান্ধীজী তখন ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন চালাচ্ছেন না। তবু ইংরাজ সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলেন। ব্রুমফিল্ড নামক বিচারকের বিচারে—বা অবিচারে—গান্ধীজী ছয় বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করলেন।

অহিংস গান্ধী হিংসার কবলে পতিত হলেন।

কিন্তু গান্ধীজীকে ছয় বছর যাবৎ কারাগারে নিগ্রহ ভোগ করতে হল না।

দণ্ডকাল শেষ হওয়ার পূর্বে তিনি এপেণ্ডিসাইটিস রোগে আক্রান্ত হলেন। তখন তাকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হল।

॥ গান্ধী মহারাজ যেন হলেন রাজ ॥

গান্ধীজী দেখলেন হিন্দু সমাজে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের প্রতি তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের প্রীতি নেই। তিনি অস্পৃশ্যদের হরিজন ব'লে অভিহিত করে, তাঁদের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সমমর্যাদা সম্পন্ন করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা উগ্র-ভাবে আত্ম প্রকাশ করল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। গান্ধীজী, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপন মানসে, একবিংশতি দিবস ব্যাপী অনশন আরম্ভ করলেন ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে।

বললেন, "হে ভারত-সন্তান হিন্দু-মুসলমান, তোমরা কলহ ক'রে এদেশে বিদেশী শাসনের ফল পাকা করে, নিজেরা বিফল হয়ো না।"

গান্ধীজীর সেই শান্তি সংঘটন-অনশন চলল দিনের পর দিন। তাঁর জীবনী-শক্তি হ'তে লাগল ক্ষীণ।

অতঃপর প্রায় তিনশত হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে গান্ধীজীকে জানালেন, তাঁরা হিন্দু-মুসলামানের মধ্যে প্রীতি প্রতিষ্ঠায় যথাসাধ্য শ্রমপরায়ণ হবেন।

তখন গান্ধীজীর অনশনের হল অবসান।

বেলগাঁও নামক স্থানে ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজীর সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন সম্পন্ন হল।

গান্ধীজী তাঁর প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে বললেন, "মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হোক প্রীতির বন্ধন ; ভাই ব'লে আলিঙ্গিত হোক হরিজন ; বিদেশী পণ্য দ্রব্য করা হোক বর্জন !"

এরপরে ভারতের ভাস্বর ভবন নির্ম্মাণে, গান্ধী মহারাজ যেন হলেন রাজ—দেশসংগঠন কর্মেই মগ্ন রইলেন কিয়ৎকাল। রাজ-নীতির ক্ষেত্রে তিনি তেমন বিরাজ করলেন না।

॥ ডাণ্ডীর প্রকাণ্ড কাণ্ড ॥
(লবণ দৈত্যবৎ লবণ-আইন)

ভারতের জনগণমন চায় পূর্ণ স্বাধীনতা। —এই বাণী বিঘোষিত হল ভারতের জাতীয় মহাসমিতির মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে।

গান্ধীজী তখন আবার অবতীর্ণ হলেন রাজনীতিক্ষেত্রে। তিনি তাঁর "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় অভিমত প্রকাশ করলেন, ঐ স্বাধীনতা প্রস্তাব ঠিক সময়োচিত হয়নি।

কলিকাতায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হল।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু হলেন তার সভাপতি। তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন, 'ভারত ইংলণ্ডের অধীনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভে সন্তুষ্ট থাকতে পারে।'

কিন্তু মতিলালের পুত্র জওহরলাল এবং মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের ভারতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করল। গান্ধীজীই ছিলেন সেই প্রস্তাবের উত্থাপক।

বর্ষকাল পরে, একদিন কলিকাতায় প্রকাশ্য স্থানে রাশি রাশি বিলাতী বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ করা হল।

বিলাতী বর্জনের বিপুল বন্যাই যেন এল। বিলাতী দ্রব্যের প্রতি মারা হতে লাগল যেন লাথি।

সেই বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব মোহনেরই এক মোহন ও মহান কর্ম, এইরূপই হল লোকের অভিমত।

এল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। গান্ধীজী, ভারতের পরাধীনতা শৃঙ্খল শিথিল করার উদ্দেশ্যে, ইংরাজ সরকারের নিকট নিম্নবর্ণিত এবং অন্যান্য কতকগুলি দাবি উত্থাপন করলেন :

(১) লবণ উৎপাদন নিষিদ্ধ করার আইন বাতিল করে দিতে হবে।

(২) অধিক বেতন-ভোগী সরকারী কর্মীদের বেতন হ্রাস করতে হবে।

(৩) সৈন্যদের জন্য ব্যয় হ্রাস করতে হবে।

(৪) মদ্যবিক্রয় বন্ধ করতে হবে।

(৫) সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীকে কারাগার হতে ছেড়ে দিতে হবে।

(৬) বন্দুক ইত্যাদি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে দিতে হবে।

(৭) জমির খাজনা অর্ধেক পরিমাণ হ্রাস করে দিতে হবে।

ইংরাজ সরকার ঐ দাবিগুলি অবগত হলেন, কিন্তু পূরণ করার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

গান্ধীজী তারপর, ৪ঠা মার্চ বাড়লাট আরুইনকে লিখিত তাঁর এক পত্রে জানালেন, তাঁর পত্র সম্পর্কে ১১ই মার্চের মধ্যে যদি প্রয়োজনানুসারে সাড়া পাওয়া না যায়, তাহ'লে, লবণ-আইন ভঙ্গ-অভিযান চালানো হবে।

পত্রোত্তরে, ন্যায়পন্থী গান্ধীজীকে অন্যায়পন্থী ইংরাজ আরুইন লিখলেন, 'আপনি আইন ভঙ্গ ও শান্তিভঙ্গ করতে যাচ্ছেন।'

ঐ সম্পর্কে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় তখন গান্ধীজীর এইরূপ অভিমত প্রকাশিত হল :

"আমি চেয়েছিলাম রুটি। কিন্তু, প্রত্যুত্তরে টিপে ধরা হল আমার টুঁটি"।

তারপর—

সেদিন ১২ ই মার্চ, প্রভাত কাল, ১৯৩০ সাল।

হ'ল সূর্যোদয়। গান্ধীজী হয়ত তার মধ্যে দর্শন করলেন ভারতের স্বাধীনতা সূর্যের উদয়।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁর আশ্রম থেকে চললেন।

কোথায় চললেন?

চললেন ডাণ্ডির সাগর সৈকতে।

কেন চললেন?

ইংরাজের জারিকরা লবণ-উৎপাদন নিষিদ্ধ করণ আইন অমান্য করার জন্য। গান্ধীজীর সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম-রঙ্গে গমন করছেন ৭৯ জন স্বেচ্ছাসেবক।

মরুপথ। তপ্ত বালুকাকীর্ণ।

অভিযাত্রী দল চলতে লাগলেন।

তাঁদের সেই চলা চলল ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত।

এইবার গান্ধীজী সদলবলে ডাণ্ডির সাগর সৈকতে সমুপস্থিত।

তারপর পরবর্তী দিবস।

সসঙ্গী গান্ধী স্নান করলেন, প্রার্থনা করলেন।

অতঃপর, মোহনদাস গান্ধী সাগর সৈকত হতে সামান্য পরিমাণ লবণ গ্রহণ করলেন।

গুণধি গান্ধীর সহকর্মীরাও তাই করলেন। তারপর লবণ তৈরী করা আরম্ভ হল।

লবণ-আইন ভঙ্গ হ'ল।

লবণ দৈত্য ছিল অত্যাচারী। লবণ আইনও ছিল ভারতস্বার্থ বিরোধী। সেই আইন ভঙ্গ করা হল।

গান্ধীজী ঘোষণা করলেন: ভারতের স্বরাজের জন্য যে কোন

ব্যক্তিই এইরূপে আইন অমান্য করতে পারেন। ভারতের যে কোন স্থানেই তা করতে পারেন।'

ভারত কিঞ্চিৎ ভাস্বর হয়ে উঠল।

উড়িষ্যার সাগর সৈকতে, মাদ্রাজের সাগর সৈকতে ভারতভক্ত ভারতীয় নর-নারীগণ উৎপাদন করতে লাগলেন লবণ।

দগ্ধ হতে লাগল ভারতে ইংরাজ শাসন।

অস্ত্রধারী ইংরাজের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র গান্ধীর ডাণ্ডির প্রকাণ্ড কাণ্ড ভারতে বিদেশীর শাসনদণ্ড দুর্বল করে দিল।

এল এপ্রিল মাসের অন্তিম অংশ। মহান মোহনদাস ঘোষণা করলেন: "আমরা ধর্সনা নামক স্থানে অবস্থিত ইংরাজের লবণ ভাণ্ডার করব অধিকার।"

ইংরাজ সরকার তখন নিষ্ক্রিয় রহিল না আর।

ভারতনেতা গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল ৫ই মে তারিখে। তাঁকে রাখা হল সারবেদা বন্দীশালায়।

নেতা কারারুদ্ধ হওয়ায়, ভারত ভীত হল না। সর্বত্র দেখা দিল ক্ষোভ ও বিক্ষোভ: হল হরতাল। ভারত হল উত্তাল।

॥ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার ॥

ইংরাজসরকারের হিংসানলের প্রতিক্রিয়ারূপে ভারতের সন্তানেরাও কোন কোন অঞ্চলে জ্বালালো ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের অনল।

কলিকাতার সন্নিকটে হাওড়ায় পঞ্চাননতলায় ভারত ভক্ত মানুষ, রেলগাড়ীর গতিরোধ ক'রে, বলপ্রয়োগ ক'রে হরতাল পালন করাতে উৎসাহী হলেন।

শোলাপুরে পুলিশথানা পোড়ান হল।

অস্ত্রবলে ভারতের স্বাধীনতা আয়ত্ত করণে সমুৎসাহী ভারতের বহু বীর সন্তানের গুলী উড়িয়ে দিল ইংরাজের পীড়ন-পটু কর্মচারীদের মাথার খুলি।

কোন কোন গুপ্তচরের জীবন গুপ্তহত্যাতেই শেষ হল।

সেই যুগে চট্টগ্রামে (বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানে) ছিল ইংরাজ সরকারের এক অস্ত্রাগার—বিদেশীর ভারতবিদ্বেষের আধার।

এপ্রিল মাসের এক দিবসে, একদল সাহসী যুবক চট্টল সূর্য —সূর্য সেনের নেতৃত্বে সেই চট্টগ্রাম অস্ত্রগার আক্রমণ করলেন, অধিকার করলেন।

ইংরাজ সরকারের সৈনিক ও পুলিশ তখন হল অভিভূত ও পরাভূত।

অতঃপর চট্টগ্রামের সেই ভারতীয় বীর যুবকগণ ইংরাজের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-সমরও করেছিলেন। ভারতের প্রাণসঞ্চার করার অপরিসীম উৎসাহবশে তাঁরা নিজেদের জীবনও বিসর্জন দিয়েছিলেন।

সেই কাহিনী কনকসন্নিভ।

॥ ভগৎসিং—রাজগুরু—শুকদেব ॥

গান্ধীজী তখন ইংরাজরাজের কারাগারে।

ইংরাজ সরকার তখন একটু বিপদ পাথারে।

ভারতের দুই বিশিষ্ট সন্তান তেজবাহাদুর সপ্রু এবং জয়াকর তখন ভারতের জাতীয় মহাসমিতি এবং ইংরাজ সরকারের মধ্যে মিটমাট সংঘটনের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ভারতদ্বেষ্টা ইংরাজ সরকারের শয়তানী স্বার্থ বুদ্ধি সেই চেষ্টাকে সুফল-প্রসূ হতে দিল না।

অতঃপর আবার হল আপোসের চেষ্টা।

এইবার ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সদস্যরা কারাগার হতে মুক্তি পেলেন, গান্ধীজী মুক্তি পেলেন।

ভারতীয়পক্ষ এবং ইংরাজসরকার পক্ষের মধ্যে এক আলেচনা সভা অনুষ্ঠিত হল।

তখন স্থির হল, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনে এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। গান্ধীজী ভারতের অগ্রগণ্য নেতারূপে সেই বৈঠকে যোগদান করবেন। লবণ আইন রহিত করা হবে। সকল রাজনৈতিক বন্দীকে বন্দীবাস হতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

গান্ধী এবং বড়লাট আরুইনের মধ্যে সেই যে চুক্তি সম্পন্ন হল, তাকে বলা হয় "গান্ধী-আরুইন প্যাক্ট"।

প্যাক্ট হল কিন্তু বিদ্বেষী বিদেশী শাসকদের মনোভাবের পরিবর্তন হল না।

ইংরাজ সরকার ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কর্মের অনুষ্ঠাতা বীর ভগৎ সিং, বীর রাজগুরু এবং বীর শুকদেবকে বধ করল ফাঁসি দিয়ে।

ভারতের উপর অত্যাচার চালানোর আইনও বলবৎই রইল।

॥ লণ্ডনে গোল-টেবিল বৈঠক ॥

ঠক বিদেশী সরকার গোল-টেবিল বৈঠক বসাল লণ্ডন শহরে সেণ্ট জেম্‌স্‌ প্রসাদে।

সেই বৈঠককে ইংরাজীতে বলা হয় 'রাউণ্ড টেব্‌ল্‌ কন্‌ফারেন্স'।

কটিবাসপরিহিত গান্ধী সেই গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করলেন।

তিনি তখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন জাহাজের ডেকের যাত্রী হয়ে। তিনি অবস্থান করেছিলেন লণ্ডননগরের এক দরিদ্র পল্লীতে। ছাগদুগ্ধই ছিল তাঁর খাদ্য। নাট্যকার বার্নাড সা তখন গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

ভারতে তখন ছিল স্বরাজ্যদল নামে একটি প্রবল রাজনৈতিক দল। সেই দলের কোন প্রতিনিধিকে সেই বৈঠকে যোগদান করার আমন্ত্রণ ইংরাজ সরকার জানায়নি।

তাই গোল-টেবিল বৈঠক দিবসে ভারতে প্রবল বিক্ষোভ সংঘটিত হল।

পুলিশও লাঠি ধরল, ভারতভক্তদের প্রহার করল। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সেই প্রহারের ফলে হার মানল না।

সেই গোল-টেবিল বৈঠকের ফলে ভারত তার ন্যায়সংগত অধিকার কণামাত্রও লাভ করল না।

তারপর আবার অনুষ্ঠিত হল দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠক। গান্ধীজী তাতে ভারতের ন্যায়সংগত দাবিগুলো প্রকাশ করলেন। তার পর ভারতের সেই ভাস্বর নেতৃপ্রবর ইংলণ্ড হতে ভারতে আগমন করলেন।

ইংরাজ সরকার ন্যায়রোধের বশবর্তী হয়ে গোল-টেবিল বৈঠক বসায় নি। তাদের মনে গোল ছিল। সেই জন্যেই গোল-টেবিল বৈঠকের বিঘোষিত উদ্দেশ্য সফল হয় নি।

॥ কুটিল ক্লাইভের কুটিল কুটুম্বদের কৌশল ॥

গান্ধীজীর ভারতে আগমনের পর, ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল।

ভারতের দাবি যদি ইংরাজ সরকার পূরণ না করে তা হলে, ইংরাজ-আইন আবার অমান্য করা হবে—এই হল সেই অধিবেশনের ঘোষণা।

দুর্বুদ্ধিপরায়ণ বিদেশী সরকার তখন গান্ধীজীকে আবার সারবেদা কারাগারে আবদ্ধ করল।

সেই বিদেশী সরকার ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে বাধা দানে সর্বদাই উৎসাহী ছিল। তারা হিন্দু সমাজের মধ্যে বর্ণহিন্দু এবং তপশীল-হিন্দু নামে দুইটা সম্প্রদায় সৃষ্টি করে হিন্দুদের এবং ভারতের অনিষ্ট সাধনে সচেষ্ট হল।

সেটা হল কুটিল ক্লাইভের কুটুম্বদের ভারতের প্রতি কালকূট প্রয়োগের একটা কৌশল।

গান্ধীজী তখন নিজের জীবন দিয়ে ভারতের অনিষ্টে বাধাদানে ব্রতী ছিলেন। তিনি আমরণ অনশন আরম্ভ করলেন।

তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু এবং তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তখন হিন্দুসমাজে ভেদসৃষ্টি না হওয়ার এক চুক্তি সম্পাদন করলেন। তাকে বলা হয় "পুণা-চুক্তি"।

ভারতদাস মোহনদাস গান্ধী তখন অনশন ভঙ্গ করলেন।

এর পরেও মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একবার একবিংশতি দিবস ব্যাপী অনশন উদ্‌যাপন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আত্মশুদ্ধির জন্য আর তাঁর সহকর্মীদের শোধনের জন্য তিনি সেই উপবাস করেছেন।

গান্ধীজী তখনও কারাগারে। তাঁর অনশন-সংকল্প বিঘোষিত হওয়ার পর, ভারতের ইংরাজ সরকার তাঁকে কারামুক্ত করল।

কুটিল ক্লাইভের কুটিল কুটুম্বদের কারাগার মহান মোহনদাসকে তার করাল কবলে লাভ করেছিল আরও বহুবার।

একবার, তাঁকে কারারুদ্ধ করার সময়ে, তাঁর সহধর্মিণী কস্তুরীবাঈ, গান্ধীজীর একান্ত সচিব মহাদেব দেশাই, জননায়ক চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী এবং আরও বহু শ্রদ্ধেয় জনকে কারাবন্ধী করা হল।

কারাগারে গান্ধীজীর প্রতি অবৈধ ব্যবহার করারও ব্যবস্থা হল।

বিদেশী সরকারের সেই পীড়নের প্রতিবাদ করার জন্য গান্ধীজী তখন আরম্ভ করলেন অনশন।

তার ফলে খুব অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই, তাঁর জীবন বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হল। সরকার তখন গান্ধীজীকে কারাগার হতে মুক্তি দিয়ে দিল।

॥ সুভাষচন্দ্র বসু ॥

(নেতাজী)

গান্ধীজী কারাগার হতে মুক্ত হয়ে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলেন না, কারণ ভারতভক্ত বহু ভারত সন্তান রাজবন্দী রূপে রয়েছেন তখন কারাগারে।

গান্ধীজী ভারতের বিভিন্ন কারাগারে রাজবন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর তাঁর প্রচেষ্টার ফলে বহু রাজবন্দী লাভ করলেন মুক্তি।

ইংরাজ সরকার ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল ভারতে এক নূতন শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করল।

কিন্তু তার ফলে প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কণা মাত্রও ভারতের আয়ত্ত হল না।

এল ১৯৩৯ খৃষ্টীয় সাল।

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্র হয়ে উঠল বেশ উত্তাল।

তার কারণ হচ্ছে, ঐ সালে ডঃ পট্টভিসীতারামিয়া ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হবেন, এইটিই ছিল গান্ধীজীর অভিপ্রেত। পক্ষান্তরে, অনেকেই ইচ্ছা করেছিলেন, যে সুভাষচন্দ্র বসু হোন কংগ্রেসের সভাপতি।

সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের সভাপতি পদ প্রার্থী না হোন, গান্ধীজীর এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পেল।

ত্রিপুরী নামক স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশনে ঐ বিষয় নিয়ে ব্যাপারটা হয়ে উঠল যেন একটু বিষবৎ। —বাদ-বিবাদের বিষয়।

শেষ পর্যন্ত, সুভাষচন্দ্র বসুরই হল জয়। তিনি ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি পদে বৃত হলেন।

কিন্তু কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ সেই অবস্থাটা মেনে নিতে চাইলেন না। তাঁরা পদত্যাগ করলেন। তার ফলে, কংগ্রেসের কাজ প্রায় অচল হয়ে এল।

অতঃপর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল কলিকাতায়।

সুভাষচন্দ্র তখন ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির পদ ত্যাগ করলেন।

পদ ত্যাগ করলেও, সেই সুমহান ভারত-সন্তান স্বদেশ সেবা ত্যাগ করলেন না।

তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। তার নাম "ফরোয়ার্ড ব্লক"। দেশ সেবা পূর্ববৎ চলতে লাগল।

ইতিমধ্যে, সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করেও দেওয়া হল।

পৃথিবীতে রাজনীতি-ক্ষেত্রে এবং সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অন্যতম বিশিষ্ট পুরুষ বীর সুভাষচন্দ্র বসু পরবর্তীকালে "নেতাজী" বলে অভিহিত হন।

ফুলের আছে সুবাস। ভারতের আছেন সুভাষ।

সুভাষ ভারতের বাস বিস্তার করেছেন ভারতের গৌরব বর্ধন করেছেন সমগ্র পৃথিবীতে।

॥ অস্ত্র ভয়ে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী নিরস্ত নয় ॥

(বিনোবা ভাবে)

পৃথিবীতে জ্বলে উঠল যুদ্ধানল ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। সেই হচ্ছে "দ্বিতীয় বিশ্ব সমর"।

একপক্ষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি। অপর পক্ষে জার্মানি ও জাপান।

ভারতের তখনকার ইংরাজ বড়লাট ঘোষণা করলেন, ভারতও যুদ্ধে যোগদান করবে। ভারত সংগ্রামরত দেশ।

স্বেচ্ছাচারী দাম্ভিক ইংরাজ বড়লাট ভারতের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই, ইংরাজের অভিমতকে ভারতের অভিমত ব'লে ঘোষণা করলেন। কিন্তু ভারতের প্রকৃত নেতারা সেটা মেনে নিলেন না।

ভারতের জাতীয়-কংগ্রেসের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তখন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা পরিচালনা করছিলেন।

ইংরাজ সরকারের অনুষ্ঠিত ভারতের স্বার্থ বিরোধী কার্যের ফলে, সেইসব কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলেন।

ইংরাজ সরকারের ভারত বিদ্বেষ ভারতে তখন জাগাতে চাইল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দ্বেষ।

মহম্মদ আলী জিন্না তখন মুসলমানদের জন্য কতকগুলো দাবি উত্থাপন করলেন।

সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

তখন একপক্ষে জিন্না এবং অপর পক্ষে ভারত-ভক্ত গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মধ্যে মীমাংসার আলোচনা অনুষ্ঠিত হল।

কিন্তু জিন্নার অভিমতের কোনরূপ পরিবর্তন দেখা গেল না। তাই সেই আলোচনা সুফলপ্রসূ হল না।

গান্ধীজী তখন এক বিবৃতি দান করে সমগ্র পৃথিবীকে জানালেন, জিন্নার দাবি পূরণ করা ভারতের জাতীয়বাদের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নয়।

এর পরে ভারতের মহানায়ক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ প্রবর্তন করলেন।

ভারত যেন দ্বিতীয় বিশ্বসমরে ইংরাজ সরকারের সাহায্য না করে; ভারত ঐ যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত নয়;—এই সব জগৎকে জানাবার জন্য অনুষ্ঠিত হল সেই সত্যাগ্রহ।

এই সংগ্রাম ভারতের সংগ্রাম নয়; এই সংগ্রাম ইংলণ্ডের সংগ্রাম; কোন ভারতীয় ব্যক্তিরই এই যুদ্ধে অর্থ দ্বারা কিংবা লোকজন দ্বারা ইংলণ্ডকে সাহায্য দান করা সংগত নয়।

—উদাত্ত ধ্বনিতে এইরূপ বাণী প্রচার করতে করতে, প্রত্যহ পথ দিয়ে চলতে লাগলেন গান্ধীজীর আশ্রমের একজন করে সত্যাগ্রহী। গান্ধীজীর আশ্রমের অধিবাসী বিনোবা ভাবে হলেন প্রথম সত্যাগ্রহী।

বিনোবা ভাবে বহু ভাষাবিদ, সতত সদ্‌ভাব পরায়ণ, বহু গুণ-ধনে তিনি ধনী। তিনি নানারূপ গ্রন্থের রচয়িতা, সর্বোদয়-নেতা, ভূদান আন্দোলনের প্রধান প্রচারক।

ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চলতে লাগল। ইংরাজ সরকারও সত্যাগ্রহীদের কারারুদ্ধ করতে লাগলেন; কিন্তু ইংরাজ সরকারের অস্ত্র-ভীতি নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীকে নিরস্ত করতে সমর্থ হল না।

"ভারত ছাড়"
("Quit India")

ইতিমধ্যে 'দ্বিতীয় বিশ্ব সমরের' গতি ইংরাজের প্রতিকূল হ'তে লাগল। জাপানের আক্রমণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের "পার্ল হারবার" মেনে গেল হার।

ইংরাজ সরকার, তখন ভারতের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্য লাভের আশায়, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাদের প্রতিনিধি শ্রীক্রিপ্‌স্‌কে প্রেরণ করল ভারতে।

কিন্তু ক্রিপ্‌সের মাধ্যমে আগত ইংরাজ সরকারের অসার প্রস্তাব ভারতের নেতৃবর্গ গ্রহণ করলেন না।

গান্ধীজী তখন ইংরাজ সরকারকে বললেন, "তোমরা এই বার ভারত ছাড়—ভারতের উপর কর্তৃত্ব ত্যাগ কর, স্বদেশে প্রস্থান কর।"

ইংরাজ সরকার ক্রুদ্ধ হল।

পরপীড়নের নেশায় প্রমত্ত ইংরাজ সরকার ৮ই আগষ্টের নিশার শেষ ভাগে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করল, অন্যান্য নেতাকে গ্রেপ্তার করল।

গান্ধীজী, কারাগারে গমনের ক্ষণে, এক বজ্রবাণী ঘোষণা করলেন: "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে"—কর অথবা মর।

ইংরাজ সরকার এই দেশের জনগণের শক্তি-সামর্থ, কার্যকলাপ স্তব্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আরও কিছু করল—তাদের সৈন্যদের জন্য বিপুল পরিমাণ শস্য গুদামে মজুদ করল; নানারকম যান-বাহন আটক করল। ভারতের জীবনযাত্রা অচল করে ফেলতে চাইল।

॥ আগষ্ট বিপ্লব ॥

ইংরাজ সরকার ভারতকে অচল করতে চাইল।

কিন্তু অচল শ্রেষ্ঠ হিমাচলের দেশের জনগণ অচল হয়ে থাকতে চাইলেন না।

ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য আগষ্ট মাসে আরম্ভ হল উদ্দাম উদ্যম। তাকে বলা হয় "আগষ্ট বিপ্লব"।

ভারতের নানা স্থানে, বিশেষ ভাবে কলিকাতায় এবং মেদিনীপুরে ভীম বিক্রমে আত্মপ্রকাশ করল ভারতের শাক্তশক্তি।

ইংরাজ সরকারের বন্দুকের গুলী তখন ছুটল, ভারত ভক্তদের মাথার খুলি টুটল; তাদের রক্তে মাটি হল লাল, কিন্তু ভারতের জনগণের উদ্যম তখনও উত্তাল।

॥ মাতঙ্গিনী হাজরা ॥

মেদিনীপুরে ভারতের বীর সন্তানগণ, ইংরাজ সরকারকে অগ্রাহ্য করে, স্বদেশীয় সরকার গঠন করলেন। তখনকার ভারতের ইংরাজ প্রভু আগষ্ট বিপ্লব প্লাবনে খেতে লাগল হাবুডুবু।

ভারতের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যেকটি কর্মীই তখন নিজ নিজ কর্তব্য উপযুক্তভাবেই সম্পাদন করেছিলেন। কাহারও আদেশের তাঁরা অপেক্ষা করেন নি। আদেশ করার মতো কেউ ছিলেনও না।

আগষ্ট বিপ্লব কালে মেদিনীপুরের তমলুকে অতিবৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা, সরকারী আদেশ অমান্য করে, শোভাযাত্রা পরিচালনা করলেন।

অসুরনাশিনী দুর্গার প্রকৃত কন্যা ধন্যা সেই মাতঙ্গিনী, সে দিনী, নিরস্ত্র হয়েও ত্রস্ত হননি, হয়েছিলেন প্রকৃত রণরঙ্গিনী। ইংরাজের অগ্নি-গুলী মাতঙ্গিনীর প্রাণনাশ করেছিল, কিন্তু তাঁর শৌর্যাগ্নি নাশ করতে সমর্থ হয় নি।

লক্ষ্য করে তার সেই উদাহরণ চিরকালই পরাধীন মানুষের স্বাধীনতা-রণ লাভ করবে ইন্ধন।

হাজারবার নমস্যা সেই মাতঙ্গিনী হাজরা হাজার-হাজার মানুষের বীরত্বোৎস।

॥ আজাদ হিন্দ ফৌজ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে, ভারত সন্তান মোহন সিং, যুদ্ধ করে ভারতকে ইংরাজের অধীনতাপাশ হতে মুক্ত করার জন্য একটি সৈন্য-বাহিনী গঠন করেন। তার নাম 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'।

ঐ যুদ্ধকালে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষচন্দ্র বসু ইংরাজ সরকারের গুপ্তচর দলের দৃষ্টি এড়িয়ে, ছদ্মবেশে ভারত থেকে চলে যান জার্মানীতে, পরে সেখান থেকে জাপানে চলে যান।

ভারতের বীর-বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তখন ছিলেন জাপানে। তিনি তখনও ভারতের স্বাধীনতার জন্য যথাসাধ্য সচেষ্ট ছিলেন। রাসবিহারী সেই আজাদহিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র বসুর হস্তে প্রদান করেন।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' ইংরাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য।

সুভাষচন্দ্র তখন অভিহিত হতেন "নেতাজী" ব'লে।

নায়ক নেতাজীর পরিচালনায় আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত ভূমির মণিপুর অঞ্চলেও বিজয়পতাকা উড্ডীন করেছিলেন, জয়-ডিণ্ডিম বাজিয়েছিলেন।

তখন হতেই "জয় হিন্দ" মহাধ্বনি প্রচারিত হয়।

নেতাজীর নেতৃত্বে "স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার" গঠিত হয়েছিল। সেই ইতিহাস ভারতের এক মহাভাস—দীপ্তি।

॥ হিংসাগ্নি নির্বাপণে অহিংসা ॥

ইংরাজ সরকারের শয়তানীর প্ররোচনায় ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতা নগরীতে হিন্দু-মুসলিম-ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব সংঘটিত হল।

উভয় পক্ষের সংঘাত-সংঘর্ষের ফলে, হিন্দু নিহত হলেন, মুসলমান নিহত হলেন, ইংরাজ সরকার উৎফুল্ল হল।

ঐ সময়ে অবিভক্ত বঙ্গদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছিল "মোসলেম লীগ" নামক এক রাজনৈতিক দলভুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা।

কলিকাতায় ইংরাজের কৌটিল্যের কালকূট ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ার পর, অক্টোবর মাসে সেই বিষ বিসর্পিত হল বঙ্গের নোয়াখালি অঞ্চলে।

যারা হত্যা করতে পারে না, তারা অন্যের দ্বারা নিহত হয়, —বিশ্বের ইতিহাসে এই অবস্থা সর্বত্রই দেখা যায়। নোয়াখালিতেও হল তাই—ভাইকে হত্যা করল ভাই।

অহিংসার প্রচারক গান্ধীজী হিংসাক্লিষ্ট নোয়াখালিতে গমন করলেন। গ্রামে গ্রামে পদব্রজে বিচরণ করলেন। 'অহিংসাই মানুষের শান্তির পথ'—এই কথা প্রচার করতে লাগলেন।

সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ বিষধারা, কলিকাতা হতে নোয়াখালিতে গিয়ে, সেখান থেকে চলে গেল বিহার অঞ্চলে। বিহারে সংঘর্ষের ফলে বহু মানুষের হাড় হয়ে গেল চুরমার ; বিবাদ, আর্তনাদ, বিষাদ, প্রমাদ ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হল পল্লী ও শহর।

গান্ধীজী বিহারে গেলেন। শান্তিবাণী প্রচার করলেন।

দেখা যায়, বোঝা যায়, পৃথিবীতে অন্যায়ের একদম অবলুপ্তি কোন দিনই হয়ত, হবে না। যারা অন্যায়কে নিধন করতে না পারবে তারা হারবে এবং মরবে।

অন্যায়কে সহ্য করতে হবে না,—শায়েস্তা করতে হবে।—না হলে, মানুষের স্বস্তি থাকবে না।

॥ স্বাধীনতার দীধিতি ॥

ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রীএটলি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ঘোষণা করেছিলেন, ভারত স্বাধীনতা প্রাপ্ত হবে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে।

সেই যুগে ভারত তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবশ।

তাই হিন্দু ও মুসলমান হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, মনের সঙ্গে মন মিলিয়ে, একসঙ্গে স্বাধীনতার অধিকার দাবি করতে ও আদায় করতে প্রস্তুত হতে পারলেন না।

সেই কারণেই স্থির হল যে, ভারত বিভক্ত হয়ে দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হবে, 'হিন্দুর রাষ্ট্র', 'মুসলমানের রাষ্ট্র'। ইংরাজ সরকার ঐ উভয়ের নেতৃবৃন্দের হাতে রাষ্ট্র পরিচালনের কর্তৃত্ব ছেড়ে দেবে,—ইংরাজের কর্তৃত্ব আর থাকবে না।

হ'লও তাই। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ইংরাজ সরকার ভারতের কর্তৃত্ব ত্যাগ করল।

গঠিত হল 'ভারত ইউনিয়ন'।

গঠিত হল 'পাকিস্তান'।

বিকশিত হল স্বাধীনতার দীধিতি—দীপ্তি।

অখণ্ড ভারত হয়ে গেল খণ্ডিত—হয়ে গেল দ্বিধা বিভক্ত।

॥ গান্ধীজীর অন্তর শান্তিতৎপর নিরন্তর ॥

স্বাধীনতার দীধিতি-উদ্ভাষিত ভারতে কলিকাতায় আবার লেগে গেল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ।

নিরন্তর শান্তিতৎপর গান্ধীজীর অন্তর ব্যাকুল হল। তিনি আগমন করলেন কলিকাতায়। আরম্ভ করলেন অনশন।

গান্ধীজীর সেই অনশন-অস্ত্র সাম্প্রদায়িকতার অসুরকে শান্ত করতে সমর্থ হল।

তাই অল্প ক'দিন পরেই, গান্ধীজীর অনশনের হল অবসান।

কিছুকাল পরেই, আবার শান্তিভঙ্গ হল অন্য স্থানে।

গান্ধীজী আবার অনশন আরম্ভ করলেন দিল্লীতে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে।

আবার দেখা গেল, গান্ধীর অন্তর শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী নিরন্তর।

গান্ধীজীর মহান প্রাণ যাতে রক্ষা হয়, সেইজন্যে হিন্দু ও মুসলমান আবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন—আমরা শান্তি রক্ষা করব—অশান্ত হব না।

গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন।

হিন্দু ও মুসলমান গান্ধীজীর দুই পার্শ্বে করলেন অধিষ্ঠান, হলেন শোভমান।

॥ নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সের গুলী ॥

পুনঃ পুনঃ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হওয়ায়, কেউ বলল, অমুক সম্প্রদায়ই এর কারণ।

কেউ বলল, না, অমুক সম্প্রদায় এই দাঙ্গার কারণ।

কেউ মনে করল, দাঙ্গা প্রশমন ইত্যাদির ব্যাপারে গান্ধীজী যা করছেন, তা ঠিক হচ্ছে না।

গান্ধীজী প্রত্যহ প্রার্থনা করতেন।

একদিন অপরাহ্ণ বেলায় গান্ধীজী দিল্লীতে প্রার্থনা-সভায় যোগদান করতে যাচ্ছেন।

সেই দিন কোন্ দিন ?

সেই দিন ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের বা ঈশাব্দের ৩০শে জানুয়ারী।

গান্ধীজীর হৃদয় মধ্যে তখন প্রীতি ও ভক্তিগীতি।

ঐ সময়ে সহসা গান্ধীজীর সম্মুখে কি এক শব্দ হল।—সেই শব্দ ভীষণ শব্দ।

—নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে নামক এক যুবকের রিভলভারের গুলীর শব্দ।

সেই গুলী গান্ধীজীর বক্ষে বিদ্ধ হল।

গান্ধীজীর বদনেও তখন শব্দ হল—"হা রাম!"

ভারতভক্ত গান্ধীজীর দেহ ভারত ভূতলে পতিত হল।

সেই সন্ধ্যা—সে এক ঘোর সন্ধ্যা—অনেক কিছুর সন্ধ্যা।

বিচারালয়ে বিচার হল মারাঠী যুবক নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে, এবং আপ্তে নামক আর একজন এবং আরও কয়েকজনের।

বিচারকের নাম হচ্ছে শ্রীআত্মাচরণ।

আসামীদের মধ্যে দুইজনকে দেওয়া হল মুক্তি ; কয়েকজনকে দেওয়া হল দ্বীপান্তর দণ্ড। আপ্তে এবং নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সের হল প্রাণদণ্ড।

॥ ভারত-ভাস মোহনদাস ॥

গান্ধীর হল মহাপ্রয়াণ।—

মহাপ্রয়াণের হল মহাপ্রয়াণ।

গান্ধীজী কটিবাস পরিধান করতেন। জামা ও জুতা ব্যবহার করতেন না। বিদেশী দ্রব্য যথাসাধ্য বর্জন করতেন।

কটিবাস পরিধায়ী গান্ধীর আর্যকার্য সশস্ত্র বৃটিশ শক্তির কটি তুর্বল করে দিয়েছিল।

গান্ধীজী প্রত্যহ চরকায় সূতা কাটতেন।

গান্ধীজীর শিল্প প্রচেষ্টা ভারতে বিলাতী বাণিজ্যকে যেন বাণবিদ্ধ করেছিল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে, এক দিকে, বৈষ্ণব বণিক বংশীয় অহিংস মোহনদাস করমচাঁদ ; অন্যদিকে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-জহ্লাদ।

ভারত বলল, 'গান্ধীজীকী জয়' !

হলও গান্ধীজীকী জয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন দলনে, ইংরাজ ধরেছিল বন্দুক।

গান্ধী তখন বিস্তার করেছিলেন বন্ধুত্বের বাণী।

গান্ধীজীকে লোকে বলত বাপুজী।

কি ছিল বাপুজীর পুঁজি ?

'সত্য'ই ছিল বাপুজীর পুঁজি।

গান্ধীজীকে বলা হয় ভারতীয় জাতির জনক।

লোকে মনে করে, সেই জনক একাধারে পাবক ও কনক।

গান্ধীজীর পুত্র ছিল, কলত্র ছিল। কিন্তু, আর দশজনের ন্যায়, তিনি পুত্র-কলত্রকেই সংসারের সার ব'লে গণ্য করেন নি। মানুষকে সেবা করাই ছিল তাঁর জীবনের সার।

গান্ধীজীর প্রধান খাদ্য ছিল ছাগদুগ্ধ। রাত্রে তিনি কোন খাদ্য গ্রহণ করতেন না।

দুর্গতজনের প্রতি গান্ধীজীর প্রীতিদুগ্ধ বিশ্বকে করছে মুগ্ধ।

গান্ধীজী প্রতি সপ্তাহে এক দিবস মৌনী হয়ে অবস্থান করতেন। সেই বাক্‌সংযত পুরুষের বাক্ অনেকের কাছে গণ্য হয় অমৃতবাক্।

কোন কোন দেশের লোক তাঁদের দেশের কোন কোন ব্যক্তিকে বলেন মহাত্মা। ভারতও তার গান্ধীকে বলেন মহাত্মা।

গান্ধীজী আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই জীবনী পাঠককে প্রদান করে যেন এক নব জীবন-ই।

ভারতের ভাষাই যাতে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হয়, গান্ধীজী সেজন্য উদ্যম প্রকাশ করেছেন।

বিদেশী ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে না। ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে ভারতেরই ভাষা।—বিদেশী ভাষা—ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হওয়া স্বাভাবিক নয়, সংগত নয়, ভারতের সম্মান সম্মত নয়?

প্রত্যেকটি মানুষেরই বিরুদ্ধ সমালোচক থাকে, প্রশংসাকারীও থাকে। গান্ধীজীর অনুষ্ঠিত কোন কোন কাজের বিরুদ্ধে সমালোচনা আছে; তাঁর নানা কাজের প্রশংসাও আছে।

গান্ধীজী অসামান্য।

গান্ধীজী মান্যগণ্য।

গান্ধীজী ধন্য।

গান্ধীজীর জীবনের ঘটনাপঞ্জী

(জন্ম—১৮৬৯ খৃঃ মৃত্যু—১৯৪৮ খৃঃ)

১৮৬৯ খৃঃ—কাথিয়াবাড়ের পোরবন্দরে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম।

১৮৭৬ "—রাজকোটের পাঠশালায় ভর্তি।

১৮৮১ "—কাথিয়াবাড় হাই স্কুলে প্রবেশ।

১৮৮৩ "—শ্রীমতী কস্তুরবার সঙ্গে বিবাহ।

১৭৮৪ "—পিতা কাবা গান্ধীর মৃত্যু।

১৮৮৭ "—প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও কলেজে প্রবেশ।

১৮৮৮ "—বিলাত-যাত্রা।

১৮৮৯ "—বিলাতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৯১ "—ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও স্বদেশ যাত্রা।

১৮৯৩ "—দক্ষিণ-আফ্রিকা যাত্রা।

১৮৯৪ "—নাটাল কোর্টে ওকালতি আরম্ভ। 'নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' ও 'নাটাল শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৬ "—ভারতে আগমন ও দক্ষিণ আফ্রিকা-সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন।

১৮৯৭ "—সপরিবারে ডারবানে অবতরণ।

১৮৯৯ "—বুয়র যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী গঠন।

১৯০১ "—ভারতে প্রত্যাবর্তন ও কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশন স্বেচ্ছাসেবকের কার্যগ্রহণ।

১৯০২ "—ব্রহ্মদেশ-যাত্রা।

১৯০৩ খৃ—ট্রান্সভালে এটর্ণির ব্যবসায় আরম্ভ ও 'ফিনিক্স আশ্রম' প্রতিষ্ঠা।

১৯০৪ ”—বিভিন্ন ভাষায় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ম' প্রকাশ।

১৯০৬ ”—ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠন ও ব্রহ্মচর্য গ্রহণ।

১৯০৭ ”—'প্রতিরোধ-সত্যাগ্রহ' আরম্ভ, ভারতীয়দের দলে দলে কারাবরণ।

১৯০৮ ”—জোহান্সবার্গে দুইবারে দুইমাস করিয়া চারিমাস কারাদণ্ড।

১৯১০ —বিলাতে অবস্থান ও 'হিন্দ্ স্বরাজ' নামক পুস্তক প্রণয়ন।

১৯১০ ”—'টলষ্টয় ফার্মের' প্রতিষ্ঠা এবং মুচির কার্যে শিক্ষানবিশী।

১৯১২ ”—'টলষ্টয় ফার্মে' মহামতি গোখেলের সহিত অবস্থান।

১৯১৩ ”—হিন্দু-বিবাহ-আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ। কস্তুরবা'র কারাদণ্ড। ট্রান্সভালের পথে চারিদিনের মধ্যে তিন-বার গ্রেপ্তার এবং তিন মাস ও নয় মাস কারাদণ্ড।

১৯১৪ ”—আশ্রমবাসীদের নৈতিক অধোগতির জন্য পনের দিন উপবাস। কস্তুরবা'কে সঙ্গে লইয়া বিলাত যাত্রা।

১৯১৫ ”—'কাইজার-ই-হিন্দ' পদক-প্রাপ্তি ও শান্তিনিকেতনে কবিগুরু কর্তৃক 'মহাত্মা' আখ্যা লাভ।

১৯১৬ ”—কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসবে এবং লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান।

১৯১৭ ”—চম্পারণ-সত্যাগ্রহ। সবরমতী-তীরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা। 'সোস্যাল সার্ভিস লীগে' সভাপতিত্ব।

১৯১৮ খৃঃ—আমেদাবাদের মজদুরদের লইয়া সত্যাগ্রহ। খেড়া

সত্যাগ্রহ। মুস্‌লীম লীগের সভায় যোগদান। যুদ্ধে সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা।

১৯১৯ "—দেহে অস্ত্রোপচার। 'রাউলাট্‌ আইনের' প্রতিবাদে হরতাল ঘোষণা। গ্রেপ্তার। তিনদিন অনশন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদনা। 'নিখিল ভারত খিলাফৎ সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

১৯২০ "—জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'কাইজার-ই-হিন্দ মেডেল' ও 'বুয়র যুদ্ধের মেডেল' প্রত্যর্পণ। দৈনিক সূতা-কাটার ব্রত গ্রহণ।

১৯২১ "—'তিলক স্বরাজ্য তহবিলে' এক কোটি পনের লক্ষ টাকা সংগ্রহ। বোম্বাইয়ে 'খাদি ভাণ্ডারের' উদ্বোধন। কলিকাতায় 'ন্যাশনাল কলেজ' স্থাপন। ভারতের সর্বত্র বিশ লক্ষ চরকার প্রবর্ত্তন। বোম্বাইয়ে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রায়শ্চিত্তের জন্য পাঁচদিন অনশন। অসহযোগ আন্দোলন। বিশ হাজার কংগ্রেসকর্মীর কারাবরণ। কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক মনোনীত।

১৯২২ "—চৌরীচৌরার দুর্ঘটনা। পঁচিশ দিন অনশন। গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড। জেলে আত্মজীবনী প্রণয়ন।

১৯২৪ "—'য়্যাপেণ্ডিসাইটিসে' অস্ত্রোপচার। কারামুক্তি। একুশ দিন যাবৎ অনশন। কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

১৯২৫ খৃঃ—সারা ভারত ভ্রমণ। 'ভাইকম সত্যাগ্রহ'। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর দশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ ও 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদন' প্রতিষ্ঠা। 'নিখিল ভারত কাটুনী সংঘের'

উদ্বোধন। আশ্রমবাসীদের নৈতিক অধোগতির জন্য সাত দিন অনশন।

১৯২৬ ”—স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর মৃত্যুতে কংগ্রেসে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন।

১৯২৭ ”—সিংহল-ভ্রমণ ও খদ্দর প্রচারে অর্থ-সংগ্রহ।

১৯২৮ ”—সাইমন কমিশন বর্জন। সর্দারজীর নেতৃত্বে বর্দোলী সত্যাগ্রহ। কংগ্রেসে এক বৎসরের মধ্য স্বাধীনতার প্রস্তাব আনায়নের সিদ্ধান্ত।

১৯২৯ ”—ইউরোপ-যাত্রার প্রস্তাব প্রত্যাখান। কলিকাতায় বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। এক টাকা জরিমানা। কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ।

১৯৩০ ”—‘ইয়ং ইণ্ডিয়ার’ এগার দফা সর্ত প্রকাশ। ইতিহাস প্রসিদ্ধ ‘ডাণ্ডী-অভিযান’। লবণ আইন অমান্য। করাচীতে গ্রেপ্তার। চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী হরতাল।

১৯৩১ ”—২৫শে জানুয়ারী মুক্তিলাভ। গান্ধী-আরউইন চুক্তি। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাত-যাত্রা। লণ্ডনে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী কর্তৃক সম্বর্ধনা। ৫ই ডিসেম্বর লণ্ডন-ত্যাগ।

১৯৩২ ”—৪ঠা জানুয়ারী পুনরায় গ্রেপ্তার। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে সাতদিন অনশন। অস্পৃশ্য-দিগকে ‘হরিজন’ আখ্যা দান।

১৯৩৩ খৃঃ—‘হরিজন সেবক সংঘের’ প্রতিষ্ঠা। ‘হরিজন পত্রিকা’ প্রকাশ। আত্মশুদ্ধির জন্য তুই সপ্তাহ অনশন। চৌত্রিশ জন আশ্রমিকসহ গ্রেপ্তার ও মুক্তিলাভ। আইন-অমান্যের জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার ও এক বৎসর কারাদণ্ড। পাঁচদিন অনশন। ২৩শে

আগষ্ট মুক্তিলাভ। 'হরিজন আন্দোলনের' জন্য ভারত-পরিভ্রমণ। আট লক্ষ টাকা সংগ্রহ।

১৯৩৪ "—বিহার ভূমিকম্পে বিহার পরিক্রমা। পুণায় গান্ধীজীকে লক্ষ্য করিয়া বোমা বর্ষণ। প্রায়শ্চিত্তের জন্য সাতদিন অনশন। 'গ্রামোদ্যোগ সংঘের' প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যপদ ত্যাগ।

১৯৩৫ "—২৩ শে মার্চ হইতে চা'র সপ্তাহ মৌনাবলম্বন। বিহারে 'হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনে' সভাপতিত্ব। সেবাগ্রামে আশ্রম প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৬ "—জাপানী কবি নোগুচি ও তামিকার সহিত সেবাগ্রামে সাক্ষাৎকার। মার্গারেট সিঙ্গার ও নিগ্রো প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা। দশ সপ্তাহ যাবৎ অসুস্থতা। 'গান্ধী সেবা সংঘের অধিবেশন' ও 'নিখিল ভারত সাহিত্য সম্মেলনে' সভাপতিত্ব।

১৯৩৭ "—কংগ্রেসী-মন্ত্রিসভা গঠন। মাদক নিবারণ। কৃষিঋণ লাঘব এবং প্রাথমিক শিক্ষা ও কারাগার ব্যবস্থার সংশোধন। কবিগুরুর সহিত সাক্ষাৎকার। ত্রিবাঙ্কুরের মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা। 'ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ', 'গান্ধী সেবাসংঘ' ও 'ওয়ার্ধা শিক্ষা সম্মেলনে' সভাপতিত্ব। 'নয়া তালিমীর' পরিকল্পনা। অসুস্থতার জন্য জুহুতে অবস্থান।

১৯৩৮ খৃঃ—সেবাগ্রামে প্রত্যাবর্তন। লর্ড লোথিয়ান ও তাকাওকার সহিত সাক্ষাৎকার। পেশোয়ার ভ্রমণ। 'গান্ধী সেবাসংঘে' সভাপতিত্ব। চেক ও জার্মান-য়িহুদীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন। মিউনিক চুক্তির সমালোচনা। রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য

কলিকাতায় আগমন। বাঙ্গলার লাট সাহেবের সহিত আলোচনা।

১৯৩৯ "—ডাঃ কাগাওয়ার সহিত আলোচনা। ঠাকুর সাহেবের চুক্তিভঙ্গের জন্য রাজকোটে পাঁচদিন অনশন। সুভাষচন্দ্রের সহিত মতানৈক্য। কংগ্রেসী-মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগের নির্দেশ। বড়লাটের সহিত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। মালিকান্দায় 'গান্ধী সেবাসংঘের' অধিবেশনে যোগদান।

১৯৪০ "—শান্তিনিকেতনে আগমন। কবিগুরু কর্তৃক সম্বর্ধনা ও দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের সহিত সাক্ষাৎকার। বড়লাটের সহিত সিমলায় আলোচনা। কংগ্রেস কমিটি-সমূহকে সত্যাগ্রহ আশ্রমে রূপান্তরিত। বিনোবা-ভাবের দ্বারা ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ পরিচালনা। পণ্ডিত জওহরলাল ও মৌলানা আজাদের কারাদণ্ড। 'হরিজন সেবক' ও 'হরিজন বন্ধুর' প্রকাশ বন্ধ।

১৯৪১ খৃঃ—কবিগুরুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ। সর্দারজীর আশ্রমে অবস্থান। পঁচিশ হাজার সত্যাগ্রহীর কারাদণ্ড ও ৬ লক্ষ টাকা জরিমানা। কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ।

১৯৪২ "—'এণ্ড্রুজের স্মৃতি তহবিলে' পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ। লুই ফিসারের সহিত সাতদিন অবস্থান। চিয়াং দম্পতি, লুই জনসন ও ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সহিত আলোচনা। 'হরিজনের' পুনঃ প্রকাশ। ৮ই আগষ্ট 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ ও গ্রেপ্তার। মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যু। ভারতব্যাপী আন্দোলন। অধ্যাপক ভাঁসানীর অনশন।

১৯৪৩ ”—দমননীতির বিরুদ্ধে একুশ দিন অনশন।

১৯৪৪ ”—২২ শে ফেব্রুয়ারী কস্তুরবা'র মৃত্যু। ৬ই মে বিনা সর্তে মুক্তিলাভ। পঁচিশ দিনের জন্য মৌনাবলম্বন। জীবনে প্রথম সবাকচিত্র দর্শন। মিঃ জিন্নাহর সহিত আলোচনা। বোম্বাইয়ের ডক বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল দর্শন। সেবাগ্রামে 'রবীন্দ্র মৃত্যু বার্ষিকী' ও 'গান্ধী জন্মতিথি' পালন। 'কস্তুরবা স্মৃতি ভাণ্ডারে' ১১০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ।

১৯৪৫ খৃঃ—মিঃ জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনা। কংগ্রেসী নেতাদের মুক্তিলাভ। সিমলায় বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা।

১৯৪৬ ”—মন্ত্রিমিশনের ভারত আগমন। 'গণ পরিষদ' ও 'অন্তর্বর্তী সরকার' গঠন। মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

১৯৪৭ ”—নোয়াখালির পল্লী পরিক্রমা। কাশ্মীর পরিদর্শন। এক দিনের জন্য অনশন। কলিকাতায় তিন দিন অনশন। 'স্বাধীন ভারতের' সূচনা। লীগ-ওয়ালাদের অত্যাচার। কাশ্মীর আক্রমণ। দিল্লীর 'এশিয়া সম্মেলনে' বক্তৃতা। অখণ্ড বিশ্বগঠনের জন্য আবেদন।

১৯৪৮ ”—দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা। পাঁচদিন অনশন। বোমা বিস্ফোরণ। নাথুরাম গড্‌সে নামক আততায়ীর গুলিতে নিহত। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারতের বিভিন্ন স্থানে চিতাভস্ম প্রেরণ।